# নির্বান্ধব

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬২
প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রাকর : বিশ্বনাথ কবিরাজ, হাতিবাগান প্রিণ্টার্স
৫৭, অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৬

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে যিনি

আন্দোলন করে তুলতে চাইছেন

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে

সব চরিত্রই কাল্পনিক। একদিন গভীররাতে
সুনীলের—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়
'...আতর গোলাপ/সাবান
খরচ প্রত্যহ' গানখানি
শুনেছিলাম।

**লেখকের অন্যান্য বই**

বৃহন্নলা

অনিলের পুতুল

কুবেরের বিষয় আশয়

পরস্ত্রী

সরমা ও নীলকান্ত

নির্বাচিত গল্প

## ১ ॥

সরকারী উকিলের সওয়াল শেষ হল।

নিবারণ পাকড়াশি সবই শুনেছে। ফাঁসির আসামীকে নির্বিকার হয়ে যেতে হয় বলে কড়িকাঠের দিকে তাকাল। তারপর ভিজিটার্স চেয়ারে। সামনের সারিতে রেবা বসে। ছেলেটা আজকাল একটানা তিন চার ঘণ্টা চুপ করে থাকতে পারে না। লাল উর্দি আঁটা পেয়াদার চার পাশে পাক খাচ্ছে এখন।

জজ উঠল। পাশের পর্দা লাগানো ঘরে গিয়ে এখন খাবে। চার বাটির টিফিন ক্যারিয়ার এসেছে একটু আগে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাইরের মাঠ অব্দি অনেকটা দেখা যায়। গরু যায়, হাকিমের বাড়ি থেকে খাবার আসছে, হাতুড়ে ডেন্টিস্ট ইলেকট্রিক মিস্ত্রির প্লাস দিয়ে সস্তায় বুড়ো বুড়ো মামলাবাজের দাঁত তুলে দিচ্ছে।

সাব ইন্সপেক্টর ছোকরা স্ট্যাণ্ড থেকে নেমে আসতে বলল। আদেশটা চোখে চোখে।

রেবা শশধর উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করছে। মজা দেখতে আসা লোকগুলো আসামীর চেয়ে তার বৌকেই বেশি দেখে আজকাল। একেবারে সিনেমার কোর্ট সিন। ডিফারেন্স শুধু, হিরো নিবারণ ম্যারেড্—বয়স সাঁইত্রিশ, মামলাটিও মিথ্যে সাজানো নয়। সে সত্যিই অনিল দত্তকে খুন করেছে। অনিল ভিলেন নয়। গত নাইন্থ সেপ্টেম্বর উনপঞ্চাশ পার করে সে পঞ্চাশে পা দিয়েছিল। দু'জনে ভাবও ছিল প্রচুর। উপরন্তু এই অনিল তার ওপরঅলাও ছিল অফিসে।

খুন লুকোনোর উপায় ছিল না। প্রায় হাতে নাতে ধরা পড়তে হয় তাকে। কেননা, ঘটনাস্থল থেকে বউবাজার থানা দু'মিনিটও না। খবর পেয়েই পুলিশ ছুটে এসেছিল। লুকোনোর কোন চেষ্টাও ছিল না তার। তাই কোন্ পথে মামলা চালাতে হবে রেবার সঙ্গে পরামর্শ করে শশধর সান্যাল তা স্থির করেছে।

খুনের ইচ্ছে ছিল না মোটেই। মন খারাপ ছিল, তারপর হুইস্কির পুরনো খদ্দের দু'জনেই, ভাগ্যিস অনিল দত্তের পেটেও খানিকটা পাওয়া যায়···নেশার ঘোরে ঠাট্টা করতে গিয়ে এই বিপরীত কাণ্ড। ইদানীং নিবারণের মনও খুব আনসাউণ্ড—

জজের টিফিনের পরেই জেরা শুরু হল ঃ

মিষ্টার পাকড়াশি হুইস্কির নেশা আপনার কত দিনের ?

কোন দিনের নয়।

বারে আপনি যখন অ্যারেস্ট হলেন—তখন সারা গায়ে গন্ধ বেরোচ্ছিল ?

তা ছিল।

তবে ?

মাঝে মাঝে খেতাম। নেশা নয় কোনদিনই।

মাঝে মাঝে মানে প্রায়ই! নেশা নয়—কেননা অল্পেস্বল্পে আপনার ধরত না। রেবার পেছনের চেয়ারে স্কুলপালানো একটা দামড়া ছেলে বসে ছিল। তাকে অব্দি হাসতে দেখে নিবারণ তেতে উঠল, হুজুর। এ সেই যুক্তি—মাসীমার গোঁফ থাকলে মামারা পাঁচ ভাই! বারবার বলছি—আমি কোনদিন হুইস্কি নেশার জন্যে খাইনি। মদ আমি খেতে ভালবাসি না।

তাহলে আপনি খেতেন কেন ?

নিবারণ একবার আদালতের সব কিছু মন দিয়ে দেখল। তারপর রেবার দুই ভুরুর মাঝখানে তাকিয়ে থেমে থাকল। ঢোলা গলার ব্লাউজে বুকপিঠ অনেকটাই ঢাকা পড়েনি। সাবধানে রুমাল বুলিয়ে

মোছা ঘাড়ে স্কাইলাইট থেকে আলো এসে বিঁধছে। এইসব জায়গায় তাগ্ মত মারলে বিনা বাধায় বাঁটসুদ্ধ ছুরি একদম বসে যাবে।

আবার বলছি। ভালো করে শুনুন নিবারণবাবু। যদি ভালই না লাগবে তবে খেতেন কেন?

আমার উপায় ছিল না। নিবারণ কাঠগড়ায় রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে—ঝুলে পড়ল। সকাল থেকেই জেরা চলছিল।

শশধর উঠে দাঁড়াল, আমার মক্কেলের মনের ওপর অযথা চাপ দেওয়া হচ্ছে। আগেই আমরা বলেছি, নিবারণ অনিলের অনেক দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—

এই সময় নিবারণ আবার ঠেলে উঠল, কখ্খোনো না—

শশধর ঘাবড়াল না। যে পথে মামলা সাজাতে চাইছে—নিবারণ আস্তে আস্তে সেদিকেই ঝুঁকছে। রেবা কিন্তু চমকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

অনিল দত্তের অন্তরঙ্গ কোনদিন ছিলাম না। অনিলদার অন্তরঙ্গ হতে চাইছিলাম—

সরকারী উকিল একটা মোক্ষম ফোঁড়ন কাটল, আপনার কি বন্ধুর অভাব ছিল? কেননা, লোকাল থানা—এস বি থেকে নিবারণ পাকড়াশির গত পনের বছরের ইতিহাস এনে এখন তার কাছেই জমা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কিছু নোট নেই নিবারণ পাকড়াশি সম্পর্কে। পরিষ্কার লেখা আছে—যতটা না পলিটিকস্, তার চেয়েও বেশি—আলাপ-পরিচয়ের জন্যেই আঠেরো বছর বয়সে আশুতোষ কলেজের থার্ড ইয়ার সায়ান্সের ছাত্র নিবারণ পাকড়াশি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের জেনারেল সেকরেটারি হয়। বাঙালী নিম্নবিত্ত জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকেই নিবারণ কলেজে পড়তে আসে। বসু পদবীযুক্ত একটি কায়স্থ মেয়ের সঙ্গে ভাব করে দাগা খেয়েছিল। স্টুডেন্ট ক্ষ্যাপানো বক্তৃতা দিয়ে সে আমলে কলেজ থেকে এক্সপেল্ড্ হয়।

কলেজের উল্টোদিকের মিষ্টির দোকানে ধারে বন্ধুদের খাওয়াত। কলেজে আট মাসের বকেয়া মাইনে শোধ দিতে এসে মিষ্টির দোকান আগে ক্লিয়ার করতে হয়েছিল। তাই আর মাইনেও ক্লিয়ার করা হয়নি। ভীষণ পপুলার স্টুডেন্ট ছিল। এস বি রিপোর্টে আছে—হি হ্যাড্ এলিমেণ্টস্ অব লিডারশিপ।

নিবারণ যাকে বলে ভ্যাকাণ্ট লুক দিয়ে সারা আদালত দেখে নিল—তারপর রেবাকে শেষে দায়রা জজ উমাপতি চাকলাদারকেও একটা ক্যাম্পখাটের চেয়ে বেশি পাত্তা না দিয়ে বলল, আমি পারছি না—আমায় ছেড়ে দিন হুজুর—আমি দোষ তো স্বীকার করেইছি—

বার লাইব্রেরিতে ঝুনো উকিল রমাপতি বাঁড়ুজ্যে কানে একটা চোঙ্ লাগিয়ে মক্কেলের বকুনি থেকে আন্দাজে মানে বের করে নিচ্ছে। আজ বিশ বছর সে কালা। গাছতলায় মুহুরি পট্টিতে সুপুরির দর নিয়ে একটা ঝগড়া হয়ে গেল। হিন্দুমহাসভার একজন প্রচারক কিসের কাগজ বিলি করছিল।

রেবাকে নিয়ে শশধর টালির চালার নীচে সেখানেই বসল। বেকেরি খালের ওদিকটায় কোন পাহারা নেই—একেবারে বেওয়ারিশ, পাকিস্তানীরা ইচ্ছে মত আসে যায়—এইসব ছুট্‌কো কথার ভেতর বড় ঘরের এক বিধবা কাঁদতে কাঁদতে দানপত্রে সই করছে, পাশে ঘাড়ে গর্দানে লোমওলা একটা গরিলা দাঁড়ানো—ভাসুর হবে, যেভাবে প্রায়ই 'বওমা' 'বওমা' করছে—দরাদরি করে ডাবওলাকে দু'টো ডাব দিতে বলল।

এসব কিছু কানে যাচ্ছিল না শশধরের, হাতের নখিতে চোখ, মাথা তুলে বলল, আপনাদের তো সিভিল ম্যারেজ হয়েছিল?

হুঁ। পরে অবশ্য হিন্দু মতেও হয়েছে—

তখন কি কোন লক্ষণ দেখেছেন?

পটাং করে চোখ তুলে তাকাল রেবা, কিসের?

এই মানে—কিছু অ্যাবনরমাল—ধরুন ইনস্যানিটির কাছাকাছি—

কখ্‌খোনো নয়—দিব্যি সুস্থ লোক—তবে বন্ধুবান্ধব পেলে একেবারে খরচখরচা করে উজাড় করে মিশতেন—যাকে বলে হার্ট আছে—

কোনরকম এপিসোড্‌? কোন পাস্ট—আনহ্যাপি অতীত—

অনেক চেষ্টা করে রেবা কতকগুলো চিঠির কথা মনে করল। নিবারণ বিয়ের অনেক আগে নাকি একটা মেয়েকে ভালবাসত। বড় জা সব বলেছে। নিবারণও রাতে শুয়ে শুয়ে বলেছিল একদিন, দু'শো টাকার একটা চাকরি যোগাড় হলেই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত—কিন্তু কিছুতেই পেলাম না। অথচ দেখ আমাদের ড্রাইভার নেপালকে মাস গেলে মাইনে দিচ্ছি দু'শো পঁচিশ—

আর একটা কথা ইদানীং নিবারণ প্রায়ই বলত। অনিলদা খুন হওয়ার তিনদিন আগেও তাকে বলেছিল। জানো রেবা, আমি 'ভালবাসা প্রাইভেট লিমিটেড্‌' নাম দিয়ে একটা কোম্পানি খুলব। সবাই সেখানে নানারকম ভালবাসার শেয়ার কিনতে পাবে। বাৎসল্য, পরকীয়া, নেহাৎ বন্ধুত্ব, অষ্টপ্রহর মেশামিশি—সবকিছুর শেয়ার থাকবে। ভালবাসা ছাড়া ওয়ার্ল্ডে সত্যি আর কিছু নেই।

আরও একটা কথা বলত নিবারণ, আমি ব্রিজ খেলতে জানি না। আমি মোটেই স্মার্ট নই রেবা। ইংরাজি জানলেও সাহস করে বলতে পারি না। মুখে হাসি রেখে শত্রুর সঙ্গে মিশতে পারি না। অবশ্য আমি লাকি—আমি অজাতশত্রু।

এসব কথা খুব সুস্থ লোকই ভাবে।

চিঠির কথা বলতেই শশধর হামলে পড়ল। সেগুলো কোথায়? এভিডেন্স হিসেবে কাজে আসতে পারে। পই পই করে বলেছি—কিছু লুকোবেন না। পাগলামির চিহ্ন ছোটখাটো জিনিসেই বেরিয়ে পড়ে—আজ রাতেই নেপালের হাতে পাঠিয়ে দেবেন।

সেগুলো তো নেই। আর ও তো পাগল ছিল না কোনদিন। নিজেই একদিন দেশলাই জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ফেলে। তাতে তো

শুধু প্রেমের কথা ছিল। মেয়েটি লিখেছিল : সব ভুলে যাও, তোমার বাড়ির অবস্থার সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারব না।

চিঠিগুলো রেবা বিয়ের পর লুকিয়ে পড়ে মন খারাপ করত। নিবারণের মন শাদা ছিল। কবে কোথায় চুমো খেয়েছে—একদিন গঙ্গার জেটিতে বিকেলে মেয়েটি কোন্ গানটা গেয়েছিল—নিবারণ তা গেয়ে শুনিয়েছে রেবাকে। তাতে আবার পাগলামি কোথায়?

আপনার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয়নি?

গোড়ায় গোড়ায় হোত।

মনে করে বলে যান—একটুও বাদ দেবেন না—

মনে করতে গিয়ে রেবা দেখল, গরিলাটা ঘাড়ের ওপরের মাথাটা পেছনে ফেলে দিয়ে মুখের গর্তে একটা ডাব উপুড় করে ধরেছে। এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ডাবটা ছুঁড়ে বাসরুটের ওপারের ড্রেনে ফেলে দিল। বিধবাটি সুন্দরী, আর কাঁদছে না, সই হয়ে গেছে।

একবার বিয়ের পরই বেহালায় আমার স্বামী আর দেওর একটা বড় বাড়ি তিনশো টাকায় ভাড়া পাওয়া যাবে বলে খবর পান। বারো চোদ্দ বছর আগে। ও জেদ ধরল, বাড়ি দেখতে আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। শরীর খুব খারাপ—যাব না শুনে ভীষণ ক্ষেপে গেল—তারপর নতুন বিয়ের ট্রাঙ্ক তোরঙ্গ সুদ্ধ আমাকে হিঁচড়ে ট্যাক্সিতে তুলল, চিরকালের মত বাপের বাড়ি রেখে আসবে—

শশধর চোখ বুজে শুনছে। জুতো জোড়া খাটের ওপর খুলে রাখা। বড় চুরি যায়। পায়ে মোজা—কানের পাশে দু'লাইন পাকা চুল, কোটের পকেটে লাল পেন্সিলের পাশে চশমার ডাঁটি, রেখে এসেছিল?

নাঃ! ময়দানের পাশ দিয়ে ট্যাক্সি ছুটছে—বাপের বাড়ির অর্ধেক পথও এগোই নি—কী কান্না!

কে?

আপনার মক্কেলের, শশধরকে বাপের বয়সী মনে হল, আমাকে

যেন কাশী মিত্তিরের ঘাটে রেখে আসতে যাচ্ছে। আমিই অবাক হয়েছিলাম—একটুক্ষণ আগের রাগ একটুও নেই।

ফিরে এলেন ?

যাব কোথায় ? উনি তখনও খুব একটা বেশি উপায় করতেন না। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। শ্বশুর ভাসুরের সংসার—ঘর মোটে চারখানা—আলো নিভলে তবে মশারির ভেতর আমরা গল্প করতাম।

আরও অনেক কিছু বলতে পারত রেবা। ভেণ্ডর কাঠের বাক্সে দলিলের কাগজপত্র সাজিয়ে বসে।

সেসময় নিবারণ অফিসের পর একটু আধটু শেয়ার বাজারে ঝুঁকেছে। টুকটাক পয়সা আসে। খোকন আসার আগে একটা কাঁচা নষ্ট হল। সেবারে নিবারণ কিছু ইস্পাত আর পাটের কাগজ নাড়াচাড়া করে একলাফে লাখোপতি। তারপর শুধুই চূড়ামণি যোগ। অফিসে কয়েকটা হাইজাম্প দিয়ে নিবারণ গ্লাসটপ টেবিল পেল। সস্তায় একটুকরো জমি জুটে যেতে এক নিঃশ্বাসে একটা বাড়িও তুলে ফেলল। টাকাটা যাতে অদানে অব্রাহ্মণে না যায় সেদিকে রেবার কড়া নজর ছিল।

একদিন শুধু—

সান্যাল মশায় একদিন শুধু—

বলে যান—

একদিন ও রাত আটটায় টলতে টলতে বাড়ি এল। বছর দেড়েকের কথা। আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি—নেপাল নতুন গাড়িতে বহাল। আপনার মক্কেল ট্যাক্সি থেকে বমি মাখামাখি অবস্থায় নেমে এল—ধোয়াধুয়ির পর বললাম, এসব তুমি কি করছ ?

সে তুমি বুঝবে না—

চেষ্টা করে দেখতাম !

বললে হাসবে।

না।

একটু মিশতে গিয়েছিলাম—তখনও তাকিয়ে আছি দেখে আপনার মক্কেল বলল, আমার স্পষ্ট মনে আছে, কেউ আমার সঙ্গে মেশে না। সবার প্রোগ্রাম আছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে—শনিরবিবার বরুণ, কেষ্ট ওরা টুক করে গালুটি নয়ত চাইবাসা চলে যায়। হীরেনরা তাস খেলে (আমার স্বামী তাস চেনে না—শেখাতে চেষ্টা করেছি, ও শুধু বলে—লাল পান, কালো পান—জে, কে, কিউ, টেন, এ)—অনিলদা আমার কথার মানে বোঝে না, আমিও ওর কথার মানে বুঝি না—আমরা দু'জনই কিন্তু বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলি না।

বাথরুমে নিয়ে গিয়ে আপনার মক্কেলের গায়ে জল ঢালছিলাম। দুপুরে যা খেয়েছিল সবই গায়ে মেখেছে। বিড়বিড় করে বলছিল, সুশীল ওরা আমায় নিয়ে যেতে চায় মাঝে মাঝে। আমি ওদের সঙ্গে হুল্লোড়ে মিশে যেতে চাই—মেশামিশি করতে চাই—চেষ্টাও করি রেবা—কিন্তু খানিক পরে আমার গলাই আমার কাছে নকল লাগে।

শশধর রেবাকে থামিয়ে দিল; একটা জামিন দিয়ে নিবারণবাবুকে যদি একবার বাইরে আনা যেত—

আনুন না—আমি বুঝিয়ে বলব, তুমি কেন ওরকম করছ? —তুমি না থাকলে আমাদের কি হবে?

আপনি বাড়ি যান—আমি দরকার মত ফোন করব—

॥ ২ ॥

আমি মদ খেতুম অকারণে। না খেয়ে আমার উপায় ছিল না। নিরুপায় লোক কত কি করে। অনিল দত্ত কোনকালে আমার অন্তরঙ্গ ছিল না। আমি ওর অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিলাম। অনিল রাজি ছিল না। তার পক্ষে কারও অন্তরঙ্গ হওয়া অসম্ভব। কেননা, অনিল দত্ত মানবতা, সততা, বিভিন্ন ন্যাশনাল হাইওয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে একনাগাড়ে তিরিশ মিনিট ভাষণ দিতে অভ্যস্ত ছিল বটে—কিন্তু নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে ভালবাসতে পারত না। নিজের সুখই ছিল তার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস। ভালো বাংলায় যাকে বলে আত্মসুখপরায়ণ—তাই ছিল অনিলদা।

অনেককেই চিনি আমি। কিন্তু কেউ আমার বন্ধু নয়। আমার কথা কেউ বুঝতো না। তার মানে আমি একজন ষোল আনা ক্রিশ্চান সেইন্ট—তাও বলছি না। আমি আসলে যা—সেকথাই হচ্ছে। আমি ঝামেলা ভালবাসি না। সরকারী উকিল কাল ল্যাংটা হয়ে সওয়াল করছিল। হুজুর, যদি লাল সালু সরিয়ে কাঠের রেলিংয়ের বাইরে তাকাতেন তাহলেই স্পষ্ট সব দেখতে পেতেন। এতবড় একটা বয়স্ক লোকের এই কাণ্ড। আদালত বোঝাই লোক—অথচ তুমি শুধু কোট পরে সওয়াল করতে এসেছ। দেবেন শী এম এ, এল এল বি তুমি আর কত প্রকারে পয়সা বাঁচাতে চাও। পাজামা পরেও এলে পারতে। আমি জানি প্রত্যেক সিজিনে তুমি আনুষ্ঠানিকভাবে সিজিনাল ফল খাও। আমের সময় আম, জামের সময় জাম। নভেমবরে কোট নামাও, এপরিলে আদ্দি।

কোর্ট হাজতের চেয়ে এই আসল জেলখানা অনেক ভাল। স্কয়ার ফুট একটাকা বাষট্টি পয়সার টালি মেঝেতে বসালে ঘরখানা ড্রইং রুম হয়ে যেত।

মিসেস পাকড়াশি ওয়েট করছেন।

বলুন ঘুমোচ্ছি—

তিনি দেখা না করে যাবেন না।

এই ওয়ার্ডেনটি সাক্ষাৎ বিবেক। সরু ফালি মত করিডরে এসে দাঁড়াতেই রেবাকে দেখে নিবারণ ফিরে যাচ্ছিল।

দাঁড়াও।

নিবারণ আর পালালো না, কি চাই তোমার?

তোমাকে—আমরা আর থাকতে পারছি না। শশধরবাবুকে অব্দি আদালতে ঘোল খাওয়াচ্ছ—ঠিক উল্টো কথা তুমি বলবেই—এবারে রেবা নাক মুছলো, চোখ মুছলো, শেষে হেসে বলল, জামিনের ব্যবস্থা হয়েছে—তুমি কিছু বলবে না, শুধু চুপ করে থাকলেই চলবে—শশধরবাবু যা বুদ্ধিমান।

আমি বাইরে বেরোবো না।

কেন?

বলব না।

কেন?

বলব না।

দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট। উঁচু দেওয়ালের বাইরে একখানা গাড়ি বর্ষার বুনো হাঁসের চেয়েও খাঁটি স্বরে গলা চিরে হর্ন বাজিয়ে বেরিয়ে গেল।

দাঁড়ানো রেবাকে রেখে নিবারণ ফিরে এল।

নিরুপায় হয়ে মদ খেতাম কেন? তার আগে বলা দরকার অনিল কেন রাজি হয়নি।

কত লোককে চিনি, অথচ কারও বুকের ওপরের ইঞ্চি দুই হাড় মাংস সরিয়ে নীচের নীল রঙের আত্মা—হৃদয়—ভালবাসা—যাই বলি, তা আমি দেখার সুযোগ আজও পাইনি। একমাত্র অনিল—

কিন্তু সেকথা থাক। তারও আগে আমি পষ্টাপষ্টি কয়েকটা সত্যি কথা বলতে চাই। রেবার ব্যাপারেই। রেবার সঙ্গে কেন আমি আর কথা বললাম না? রেবা অসতী নয়। রেবা হাজার টাকার নোট।

তবু বলিনি, কারণ রেবার সঙ্গে আমার আর কোন রিলেশন নেই। বাংলা তেরোশো অত সনেই ততই জ্যৈষ্ঠ রেবার সঙ্গে আমার হিন্দুমতে শুভপরিণয় হয়। স্ববর্ণেই হয়েছিল। ভালবাসা, বিয়ে—সব ব্যাপারে আমারই ইনিসিয়েটিভ ছিল। রেবা চিরকালই সুপ্ত ফণিনী। তাই মনে করতাম অন্তত। আমার স্টেটমেণ্টে সুপ্ত কথাটা সত্যি। রেবা আজও ফণিনী হয়েছে কি না সন্দেহ। অথচ, আমি চাইতাম, মানে আজও হয়ত চাই—একবারের জন্যও ও ফুঁসে উঠুক। তা ওঠেনি। উঠতে উঠতে ওঠেনি।

একদিন নতুন বিয়ের পরে শুধু বলেছিল, তুমি উদার—সুপুরুষ—

গায়ে তখন ওর জ্বর ছিল। আমার বারবেল-করা বুকের মধ্যে ওকে চেপে ধরেছিলাম। পরিষ্কার একটা নীল আলোয়—হয়ত রেবার ভালবাসার ঘিয়ের প্রদীপটা ওর সছিদ্র বুকের বাইরে আলো পাঠাচ্ছিল—মশারি নীলচে হয়ে উঠেছিল।

আমার তখন মাথায় অনেক চুল। ইদানীং দাড়ি কামানোর সময় কতদিন ভেবেছি দাড়ির সঙ্গে দু'গালের বাড়তি মাংস কামিয়ে নাবিয়ে দিই—আগের মত ইয়ং হই। হতে পারিনি। রেবাও কোনদিন ফুঁসে উঠতে পারেনি।

আমরা কেউ কিছু হতে পারিনি। মাঝে মাঝে রাগে দাঁত ঘসেছি। অতিরিক্ত সিগারেটে দাঁতগুলো এনামেল হারিয়েছে—কিংবা অন্য কিছু। ঘসতেই শিরশির করে উঠেছে।

অথচ আমার বাবা হতে আটকায়নি। খোকনের মা সারাদিন ধরে খেটেখুটে আমাকে অফিসে, শেয়ারবাজারে পাঠাবার মত দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আমি আয় করে রোজ রেবাকে ভদ্রমহিলা বানিয়েছি। এদের দেখে লোকে ট্রামে বাসে সিট ছেড়ে দেয়।

রেবা আমার বৌ বলে হয়ত সব অনুরোধেই রাজি হত। কিন্তু একটা অনুরোধ আমি কোনদিন করতে পারিনি। একখানা স্টেনলেস স্টিলের চামচ ওর বুকের ভেতর বসিয়ে দিয়ে সুধা, ভালবাসা বা আত্মা অর সোল—যাই হোক—তাই খানিকটা আমি ওপরে আলোয় তুলে এনে দেখার ইচ্ছে রাখি। মানে রাখতাম। কিন্তু কোনদিন তা করা হয়নি।

রেবা। আমি তোমায় দীর্ঘদিন আশায় আশায় রেখেছি। সে আশা হল, আমাদের একটা বাড়ি হবে ছোট মত ( খুব ছোট হয়নি শেষ পর্যন্ত ), ফাউ একটা গাড়িও হয়ে গেছে—মায় একজন ড্রাইভার। গাড়ি কিনে অনেকে যেমন পেছনের সিটে বসে ড্রাইভারকে আস্তে চালাতে বলে কিংবা মেরামতির বিল দিতে দিতে বিরক্তিতে গাড়িটা প্রায় মাথায় নিয়ে চলাফেরা করে—আমি তা কোনদিনই করিনি রেবা।

ওই আশার পেছনে আমি আর তুমি অনেকদিন ঘুরেছি, দু'জনে কষ্টও কম করিনি। শেষকালে কষ্টটা বিরক্তিতে দাঁড়িয়েছিল। ভুললে চলবে না, আমি জীবন শুরু করেছিলাম মাস মাইনে একাশি টাকায়।

আমি তোমার কাছে কষ্টে কষ্টে পুরনো হয়ে উঠলাম—তুমিও আমার কাছে একখানি কঠিন রমণী হয়ে দাঁড়ালে। মুখে হাসি নেই, শুধু কাজ—শুধু রদ্দুর—শুধু বিরক্তি।

আমি সামান্য উনিশ বিশের ভুলে তোমাকে কতবার বলেছি—অকর্মণ্য, অপদার্থ। শেষ দিকে দু'একদিন বোধহয় শুয়োরের বাচ্চাও বলেছি। তুমি বলেছ, আমিও আর পারি না—ছেড়ে দাও আমাকে। অথচ, তখন আমাদের অভাব কমে আসছিল।

আমি আবার বলেছি, শুয়োরের বাচ্চা। গলা টিপে মেরে ফেলার ইচ্ছে হয়েছে। পরে আবার ভীষণ কষ্টও হয়েছে। অথচ তুমি কিছুতেই আমার বন্ধু হলে না। হবার কোন চেষ্টাই ছিল না তোমার।

কেবল বৌ হয়েই থাকতে ভালবাসলে। তোমার সঙ্গে মেশা গেল না। আমি মেশামিশির জন্য এক একদিন পঁচাশিটাকার ট্যাক্সি দাবড়ে কলকাতা চষে ফেলেছি—যদি কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। প্রায় দিনই হয়নি। সেসব দিন ডবল বিষণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছি—তখনও তুমি পুরনো কথা বলে আমাকে খুঁচিয়ে আনন্দ পাচ্ছ। আমি হুইস্কি খাই না। খেতে ভালবাসি না। যেটুকু খেয়েছি, তার জন্য তুমি দায়ী। ইচ্ছে করলেই তুমি আমার বন্ধু হতে পারতে।

যেমন—

(ক) আমি তোমার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসতে ভালবাসি। তুমি কোনদিন তা বসনি। খুব সাধ্যসাধনা করলে কিংবা বকুনি দিলে তবে বসেছ। ততক্ষণে পাশাপাশি বসে খাওয়ার আনন্দ নষ্ট হয়ে গেছে।

হয়ত আমাকে ভালোভাবে খাওয়ানোর জন্যই তুমি তখন সর কেটে ঘি বানাচ্ছো। কিংবা আমার পাঞ্জাবির পকেট উল্টে চারমিনারের কুচি কুচি তামাক টুকরো ঝেড়ে নিয়ে কলতলায় কাচতে চলেছ।

(খ) মনে আছে কি না জানি না, একটা লোক আমাদের বাড়ি এসে বগেরি, ডৌখোল নয়ত স্নাইপ দিয়ে যেত। এক বালতি জলে পাখিগুলো খানিক চুবিয়ে মেরে তারপর কেটেকুটে দিত লোকটা।

একদিন তেমনি কাটাকুটির পর রান্না হয়েছে। ভাসুর শ্বশুর আছে বলে তুমি আমার পাশে বসে শত অনুরোধেও খেলে না। নতুন বৌ, পাশের ঘরে দেড়গজ ঘোমটা ফেলে খেতে বসলে। রাঁধুনী ভাত বেড়ে দিল আমায়। রাগে রাগে আমি পাঁঠা কাটার রামদা হাতে নিয়ে তোমাকে কাটতে উঠেছিলাম।

(গ) বিয়ের পর পর যে-বাড়িটায় আমরা ছিলাম, তার বিশাল ছাদ থাকলেও সিঁড়ি ছিল না। আমরা সবাই বাঁশের মই চড়ে ওপরে উঠতাম। বুড়ো বয়সে মা অব্দি উঠেছে। ছোটবেলা থেকেই

ছাদে তোমার এত ভয় জানতাম না। বিকেল বিকেল অফিস থেকে এসে ভেবেছিলাম দু'জনে ছাদে বসে তোমার করতলে রাখি মা-আ-আ গানটা শুনবো। মই চড়ে হাত বাড়িয়ে তোমাকে ওপরে উঠে আসতে বললাম। কিছুতেই ছাদে উঠলে না। যেন উঠলেই পড়ে যাবে। অথচ আমি রয়েছি। আমি কি কার্নিশ থেকে ন্যাড়া ছাদের বাইরে তোমায় ফেলে দিতাম। তখন তো তোমায় আমি কত ভালবাসি।

বনেদী কয়েদীরা দেওয়াল ঘেরা মাঠে ফুটবল খেলছে। দূরে জেলর সাহেবের কেয়ারি করা বাগানে থাক থাক ফুলের ঢেউ।

নিবারণের পরিষ্কার মনে হল—এমনকি রাতে খাটে শুয়ে যখন রেবাকে ধরেছে, তখন ও শুধু একজন মেয়েলোক হিসেবেই কাছে এসেছে। বা, আমি সেই ভাবেই তোমাকে কাছে টেনে এনেছি। রাতে সবসময় তুমি এত বেশি সতী হয়ে থেকেছ, এত শান্ত, এত ঠাণ্ডা—আমার সবসময় মনে হত, আমি বোধহয় আইন আদালতের সেই সব মামলার আসামী, যাদের ধর্ষণের জন্য আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

তুমি নিজে থেকে এগিয়ে কোনদিন আমায় চুমু খাওনি। সবসময় আমাকেই এগোতে হয়েছে। কিন্তু কেন? আমি কি চুম্বিত হওয়ার মত লোভনীয় ছিলাম না? হোয়াই?

আমি তোমায় বলেছিলাম, এত সুন্দর দাঁত পান খেয়ো না কোনদিন। পান খেয়ে হাসলে তোমায় ঠিক ঝি লাগে। পান ছেড়ে দিলে তুমি। বলেছিলাম, পেঁয়াজ খেয়ো না, চুমু খাওয়ার সময় পবিত্র পাঞ্জাব-হিন্দু হোটেলের ভেজিটেবল্ চপ খাচ্ছি মনে হয়। তুমি পেঁয়াজ ছেড়ে দিলে।

আমি পান মুখে দিয়ে সিগারেট টেনে সুখ পাই। তুমি একদিন বলেছিলে, পানের সাথে সিগারেট টানলে বিচ্ছিরি গন্ধ হয় মুখে। আমি তোমার কথা শুনে সে অভ্যেস ছাড়িনি। তুমি ফিরে কেন

বললে না আবার। কেন বললে না, পান সিগারেট একসঙ্গে খেয়ো না।

বলনি, কারণ, তোমাকে তো আর আগ বাড়িয়ে আমায় চুমু খেতে হয় না। চুমু বল, ঝাঁপিয়ে পড়া বল, সবই আমাকেই করতে হত। শেষকালে দেখলাম বিয়ের পর রান্নাবান্না, চা করা ইত্যাদি এপিসোডের মত রাতের বেলার ওই আধঘণ্টা পঁচিশ মিনিটকেও তুমি করণীয় অনুষ্ঠানের আইটেম ছাড়া কিছুই ভাবো না। কেননা, ওসব কাণ্ডের পর তুমি দিব্যি ভোস ভোস করে ঘুমোতে। কিন্তু এমন তো কথা ছিল না।

অনিল দত্ত উনিশশো একুশে জন্মায়। আমি তেত্রিশে। তাকে আমার খুন করার কথা নয়। এর আগে আমি কখনো খুন করিনি। আমার জীবনে যেখানে যেটুকু সাফল্য তার মূলে ছিল অনিলদা। তিনি নিজেই বলতেন, 'নিবারণ আমি তোমায় প্রেস্টিজ দিলাম—ভদ্রলোক হয়ে উঠতে সাহায্য করলাম।'

এই লোকের সঙ্গে হুইস্কি চিলি-চিকেন খেতে বসে এই বিপরীত কাণ্ড। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নার্সরা বুকের ভেতর থেকে টেবিল ফর্কটা টেনে তুলেছে। ততক্ষণে ডাক্তার নাকি 'ডেড' ডিক্লেয়ার করেছে। সরকারী উকিল সেদিন এসব ঘটনা বলে দায়রা জজকে বোঝাতে চাইছিল, নিবারণ পাকড়াশি ছাড়া থাকলে সমাজের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক। চরমতম দণ্ডও নাকি তার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর।

ছাখ্ দেবেন শী তুই যদি আমার মনের অবস্থা জানতে চাইতিস তবুও তোকে কিছু বলতাম না। অন্য শাস্তিতে আমার কি হবে! ভগবানই আমায় মেরে রেখেছে। আমি যে কারও সঙ্গে মিশতে পারি না। মেশামিশির কত চেষ্টা করি। হয় না। কারও সঙ্গে আমার প্রাইভেট টক্ হয় না। সাইড টক্ হয় না। আমার কাছে আমার নিজের বা পরেব কোন গোপন কথা লুকোনো নেই। আমি কোনদিন দল পাকিয়ে ষড়যন্ত্র করার চান্স পাইনি। কেউ আমাকে

কানে কানে কোনদিন কিছু বলেনি। সো কল্ড্ বন্ধুদের কোডে কথা বলে হাসাহাসি করতে দেখে আমি আন্দাজে তাদের সঙ্গে গোবোধের হাসি হেসেছি শুধু।

কিন্তু অনিলদা আমারই হাতে মরবে তা আমরা নিজেরাও ভাবিনি কোনোদিন। অমন সুন্দর লাবণ্যমাখানো লোকটা মরে গেল। আমারই জন্য।

টাইটেলের সিভিল সুটে কাগজপত্রই সব। হাকিম সাক্ষীসাবুদ দেখেন ঠিকই। কিন্তু কাগজ দেখেই রায় দেন। ক্রিমিনালে কনসিকোয়েনসিয়াল এভিডেন্সই সব। সাক্ষীই কেসের হাল ঘুরিয়ে দিতে পারে।

মক্কেল নিবারণ পাকড়াশির হাতে ডিসিজড্ অনিল দত্তর মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষী ইয়েলো বেলুন বারের আট নম্বর বেয়ারা ডেভিড্ আবেল—ইনডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান, পুরনো দাগী আসামী। পুলিশের খাতায় আছে—ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টায় আছে আজ চার বছর।

॥ ৩ ॥

বেসিমার সাহেব ইস্পাত তৈরির চুলো বানিয়েছিল—সে একশো বছর হয়ে গেল। কত দেশ সে-চুলোর আদল পালটে পালটে আরও মেকদার সব ইস্পাত ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করেছে। তাতে টাটা, বার্নপুর, ভদ্রাবতীও পিছিয়ে নেই। কিন্তু বেলুড়ের গ্রেট ন্যাশানাল আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল বোধহয় খোদ বেসিমার সাহেবের কাজকর্ম করার ভাঙাচোরা চুলোটাই কিনেছিল। তাকে কেউ ওপেন হার্থ ফারনেস বলবে না। অথচ সেই ফারনেসেই সাত ঘণ্টা অন্তর তিরিশ টন স্টীল বেরোতো—স্লাগের পাহাড় ফি-মাসে ফার্টিলাইজার কোমপানি এসে কিনে নিয়ে যেত। স্টক ইয়ার্ডে জগতের তাবৎ পুরনো লোহার জংধরা স্তূপ—সেই স্ক্র্যাপ আয়রণ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্রেন চুমো দিয়ে তুলে নিয়ে ফারনেসে গিয়ে ফেলে। কয়েক ঘণ্টার ভেতর সেসব লোহা, পিগ আয়রণ, ডলোমাইটের সঙ্গে রান্না হয়ে পিটসাইট থেকে আনকোরা ইনগট হয়ে আসে।

এই হল জগন্নাথদাস-বদ্রীদাস আগরওয়ালার ব্যবসা। অল্পবয়সে দু'ভাই খিদিরপুরের লোহাপট্টিতে বসে বাতিল লোহা কিনতো। তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে আজ এই চার হাজার লোকের কারখানা চালায়, কাগজকল কিনেছে, স্ক্রুপ বানায়—কত কি। ম্যাঙ্গো লেনে সেলস্ অফিস। সেখানে অনেক বাঙালীবাবু চাকরি করে। তাদের মাথার ওপর আছে সেলস্ ম্যানেজার অনিল দত্ত। লোহার হন্দর সতের টাকা থেকে ঠেলে ঠেলে আজ বাহান্ন টাকা। এই লম্বা রাস্তার সবখানি অনিল দত্তর নখদর্পণে।

অনিলের যখন সাঁইত্রিশ, নিবারণের বয়স ছিল পঁচিশ। সেই সময়ে দু'জনে দেখা।

রেবা বলল, আপনার মক্কেলের চেয়ে বারো তের বছরের বড় ছিলেন অনিলদা। এত ভালো মানুষ কি বলব। ওঁকে চোখে চোখে রাখতেন আবার ঝগড়াও হত।

কি রকম?

আমাকে সব বলেনি কোনদিন। তবে, যেদিন অফিসে ওঁর কাজের খুব প্রশংসা করতেন—সেদিন ও বাড়ি ফিরে সব আমায় বলত। আবার যেদিন গালাগালি খেত—সেদিন চুপ হয়ে থাকত সবসময়। এক একদিন বলেছে—এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে কালই মুখার্জিবাবুদের গদিতে গিয়ে দেখা করব। আমার সঙ্গে সঙ্গে গাদাখানেক খদ্দের বেরিয়ে গেলেই বুঝবে।

খুব ঝগড়া হত।

হলেও খুব মিলমিশ ছিল দু'জনে।

কদ্দিনের আলাপ দু'জনের?

'তাও বারো তের বছরের। আমার বিয়ের কিছুকাল আগে থেকেই।' এখানে রেবা এত বিপদের মাঝখানেও কিছুক্ষণের জন্য লাজুক হয়ে পড়ল। শশধর উকিলের ঘরে কাচের আলমারি বোঝাই আইনের বই। একটু অগোছালো মানুষ। ক্যালেণ্ডারে তারিখের গোছা পালটানো হয়নি। লজ্জার মাথা খেয়ে রেবা বলল, বিয়ে করার আগে ও আমাকে দেখানোর আগে অনিলদাকে নিয়ে এসেছিল।

শশধর চোখ বুজে সব শুনে যাচ্ছিল।

রেবা তার বাপের বাড়ীর শ্যাওলা ঢাকা কম্পাউণ্ড ওয়াল মনে করতে চাইল। বিয়ের সময় দেওয়াল ঘেষে অনেকগুলো পাতাবাহার গাছ ছিল। তাতে রাস্তার ধূলো পরতে পরতে পড়ে থাকত। টোকা দিলে ঝুর ঝুর করে পড়ে যেত। দশ বারো বছর আগেকার আলো, ধূলো, বিকেল—সেসব কোথায় গেল। তখন আমাদের এত ছিল না—কিন্তু আরও অনেক কিছু ছিল তো।

অনিলদাকে কেন যে খামোকা খুন করে বসল।

মানুষটা জেলের বাইরে বেরিয়ে এলেও জানা যেত। কিন্তু কিছুতেই জামিন নেবে না। বেশ কিছুকাল ধরেই নিবারণকে সে বউ হয়েও ঠিক ঠিক ধরতে পারছিল না—বোঝাই যাচ্ছিল না মানুষটাকে। একদিন অফিস থেকে ফিরে বলল, আজ মেশামেশি করতে গিয়েছিলাম—

কিরকম ?

একটু মাথা নীচু করেই নিবারণ বলল, সে তুমি বুঝবে না।

আমি তোমার বিয়ে করা বউ আমি বুঝব না—তবে কে বুঝবে ?

এইতো মুশকিলে ফেললে। কেন যে তোমাকে বলতে গেলাম। এখন বোঝাই কি করে—

চেষ্টা করেই দেখ না।

'বিকেল হতেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অনেককাল লোহার পার্টি, কমিশন, ব্যাজের রেট—এসব নিয়ে আছি। ভাবলাম—যাই দেখে আসি পুরনো বন্ধুদের। ওদের সঙ্গে সিনেমায় লাইন মেরেছি, বি এ পরীক্ষার রেজাল্টবই হকারের হাত থেকে থাবা মেরে ছিনিয়ে নিয়েছি—ভাবলাম দেখে আসি ওরা কেমন আছে।'

কেমন দেখলে ?

লোক পালটে যায় রেবা।

বউ তাকিয়ে আছে দেখে নিবারণ বলেছিল, কফি হাউস ভর্তি নতুন লোক। চেনা কাউকে পাইনে। শেষে কোণের দিকে জানলার ধারে কয়েকজনকে পেলাম। বিমান আজও বিয়ে করেনি। হাফসার্টের হাতার বাইরে দু'হাতে এখনও পাউডার মাখে। সামনের দিকে পোকায় কাটা দাঁত তুলে ফেলে বাঁধিয়েছে। আমাকে পেয়েই বলল—কিসে এলি ? ট্যাক্সিতে ? ছেড়ে দিসনি তো ? বললাম, না। সঙ্গে সঙ্গে পুরো দলটা উঠে গেল। আমিও পেছন পেছন বাইরে নেমে এলাম। আমারই দাঁড় করানো ট্যাক্সিতে ওরা বসে বলল, ট্রাম বাস ফাঁকা হলে আরামে চলে যাস।

হেল্পলেস! দোকান বন্ধ হয়ে যাবে ভাই। নে ভাড়াটা মিটিয়ে দে।

রেবার দিকে তাকিয়ে ছিল নিবারণ, দু'চোখই ঝুলে পড়েছে, 'দিশীর দোকানে যাবে—তাতে আবার অত পড়িমরি করে ছোটা কেন? এদিক ওদিক কত দোকানেই তো রাতভোর মেলে।'

তুমি গেছলে কেন—

সে তুমি বুঝবে না। আমার যে আর ভাল লাগে না। ছেলে মেয়ে, বাড়িঘর, বউ—সব নিয়ে যে আমি নগর বসিয়েছি। আমাদের গরম কাপড়ের ট্রাংকে তুমি ন্যাপথালিন রাখো ফি' বছর। এরপরে আর পারা যায়? তুমিই বল—

রেবা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সব কথার আলাদা আলাদা মানে হয়—কিন্তু একসঙ্গে করলে কিছু বোঝা যায় না। আমি কি দোষ করলাম। আমি চিরকালই গোছানো লোক। নিবারণ প্রায়ই পুরনো কথা বলে। আমার শাশুড়ি বেস্পতিবার সন্ধ্যে হলে চিলেকোঠায় লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তেন। ওরা নাকি ছোটবেলায় ভাইরা সব সিঁড়ির এক এক ধাপে বসে বসে শুনতো। শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নায় ছাদ ভরে যেত। একবার ছাদের কার্নিশে একটা লক্ষ্মীপেঁচা এসে বসেছিল। তখন শ্বশুরমশাই বাগেরহাটে ফার্স্ট মুনসেফের পেশকার। আমার এসব শোনা।

উইকএণ্ডে বিমান, সুশীল ভদ্র, অমরেশ পাল—ওর অনেককালের বন্ধুরা সবাই মিলে দু'শো দেড়শো মাইল দূরে চলে যায়। সোমবার হলেই হাঁপাতে হাঁপাতে শহরে ফিরে আসে। চোখের নীচেটা কালো হয়ে থাকে। মুখে গত দু'দিনের গল্পের খই ফোটে। ও এসব শুনে এসে আমাকে রাতে বলে, আর বলে, জানো রেবা আমার এরকম কোনদিন যাওয়া হল না। ভীষণ যেতে ইচ্ছে করে। আবার ভয়ও করে। যদি খুশির হুল্লোড়ে গিয়ে সুর মেলাতে না পারি।

রেবার তখন রেডিওতে শোনা একটা পল্লীগীতি মনে পড়ে—'কাক

কোকিলের একই রং সুরে মেলে না।' পল্লীগীতি, না তরজা? গানটায় কাক না বলে 'কাগ্' বলতো রেডিওর অদৃশ্য গাইয়ে।

শশধর বলল, চুপ করে আছেন কেন? যা মনে পড়ে বলে যান।

প্রায় ধমক খেয়েই রেবা শুরু করে দিল, ওর এক বন্ধুর নাম সুশীল ভদ্র। তাকে ও ভীষণ ভালবাসে। সুশীলকে খেতে বললে, সারা বাজারটাই কিনে আনবে। কেন জানেন? সুশীল নাকি নেশা করার পর ওকে মায়ের মত স্নেহ করে। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়—

শশধর মাথা তুলে তাকাল।

আপনি বাপের বয়সী লোক। কিছু লুকোবো না। উনি একদিন সুশীলের খোঁজে দিশী মদের দোকানে গিয়ে হাজির। সুশীল আসেনি। সুশীল যে-টেবিলে বসে সেখানে বসে একা একা অনেকটা খান। অভ্যেস নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখেন—নেশা হয়ে গেছে।

কলেজ স্ট্রীটের মেসে অমরেশ পালের ফাঁকা বিছানায় গিয়ে পড়ে পড়ে ঝাড়া তিন ঘণ্টা এক কাতে ঘুমিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে আয়নায় দেখেন—ডান কানটা আগাগোড়া কালো হয়ে গিয়েছে। আমি তো জানি কেন। ডান কাতে শুয়ে থাকায় কানেব ভেতর রক্ত বন্ধ হয়ে ছিল। দু'দিনের ভেতর কান নরমাল হয়ে গেল। কিন্তু আজও ওঁর ধারণা—কানটা কালো হয়ে আছে। ও নাকি দেখতে পায়। শুধু আমরাই পাই না। বলুন তো এসব পাগলামি না।

শশধর মুখের ওপরেই বলল, তা তো বলতে পারছি না। মনে মনে তখন শশধর বলছিল, পাগল—তবে, সেয়ানা। ফিরে সুরু করল, আপনি ওনার স্ত্রী। আপনি জানেন না—ওনার মনে কোন দুঃখ—কোন পারটিকুলার দুঃখ ছিল কি না—

আমি তো তেমন কিছু পাইনি। তবে এটা জানি—উনি দুঃখ খুঁজে বেড়াতেন। খুব হৈ চৈ-এর লোক ছিলেন আগে। ক' বছর

হল পালটে যাচ্ছিলেন। এই কিছুদিন হল প্রায়ই বলতেন—'আমাদের সময়ে, আমাদের ছোটবেলায়, আমার সময়কার মানুষ'—

তাতে কি হল ?

ওঁর কি এতই বয়স হয়েছে ? এখন কেন বলবে আমার ছোটবেলা, আমাদের বয়সে—

উনি হয়ত বুড়ো হয়ে পড়ছিলেন।

আমার মনে হয়—ওঁর কোন অভাব ছিল না, উদ্বেগ ছিল না—প্রয়োজন ছিল না। তাই উদ্যম কমে যাচ্ছিল, মোটা হয়ে পড়ছিল, বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল রোজ রোজ। ইদানীং প্রায়ই বলত—ওর একদম ছোটবেলার সবচেয়ে পুরানো স্মৃতির কথা—কবে নাকি রাত থাকতে পাড়ার দিদিদের সঙ্গে বকুল ফুল কুড়োতে যেত। আকাশে চাঁদ থাকতে থাকতে বুনো লতার সুতোয় মালাটা গেঁথে ফেলত। জায়গাটার নাম ছিল বকুলতলার মাঠ। সেই মাঠে একটা বাতাবি গাছ ছিল। তাতে গোল গোল কাঁচা বাতাবি ঝুলে থাকত। কতদিন স্বপ্নে দেখেছে। আর ছিল ইট গুঁড়োনোর একটা বাতিল সুরকি কল—জংধরা লোহার হাড়পাঁজরা বের করে সেটা নাকি ওর স্বপ্নের ভেতরের বৃষ্টিতে ভিজে যেত—খাঁ খাঁ রোদের দুপুরে পুড়ে যেত। সেজন্য ওর নাকি কষ্টের অন্ত ছিল না। আর ভয় ছিল—একদিন ওই সুরকি কল চালু হলেই সবার আগে ওঁকেই গুঁড়িয়ে সুরকি বানানো হবে—

আপনি বাড়ি যান মিসেস পাকড়াশি।

শশধর না থামালে আরও অনেক কিছু বলার ছিল রেবার।

'আপনাকে বোঝাতে পেরেছি ?'

মাথা নাড়ল শশধর। চেয়ার থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু একজন ভদ্রমহিলা—তার স্বামীর ভাগ্য আদালতে ঝুলছে—অতএব শশধর উকিল উঠে এসে সদর দরজা অব্দি এগিয়ে দিল রেবাকে।

॥ ৪ ॥

আজ্ঞে আমাকে সবাই আবেল বলেই ডাকে। আসল নাম ডেভিড আবেল।

উল্টোদিকের কাঠগড়ায় হলফনামা সেরে একটু আগে নিবারণ দাঁড়িয়েছে। আজ শশধর কালো গাউনটা কেচে পরে এসেছে।

ওঁকে চিনতে পারেন কিনা দেখুন।

আবেল নিবারণের দিকে তাকিয়ে বলল, সাহেবকে আমি অনেকদিন চিনি।

কিরকম চেনেন ?

খুব হাতখোলা সাহেব। ঝাঁকে ঝাঁকে বন্ধু নিয়ে আমাদের দোকানে যেতেন। সবার বিল শোধ করার জন্য উনি মুখিয়েই থাকতেন। শেষে আমরা ওঁর চেক নিতাম।

উনি হুইস্কিই বেশি খেতেন ?

নাঃ! সাহেব আর খেতেন কোথায় ?

তবে ?

অর্ডার দিতেন। খেতেন সঙ্গীসাথীরা। দত্ত সাহেবের সঙ্গে এলে অবশ্য ওনাকে আর দিতে হত না। এমনিতে ব্ল্যাক নাইটের অর্ডার পড়ত বেশি। মাঝে মাঝে কুইন অব কুইনস্—

তাহলে বলতে চান—পাকড়াশি সাহেব টেবিলে গ্লাস সাজিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন ?

একটু আধটু মুখে দিতেন বৈকি। ব্যাস ওই পর্যন্ত। সাহেবকেই বলুন না, ওনার গ্লাসে আমি বেশি বেশি সোডা ঢেলে দিতাম কি না—

অনিল খুন হওয়ার পর নিবারণ লাইনের এপারে চলে এসেছে।

ওপারে নিশ্চিন্ত লোকরা থাকে। এই সেদিনও সে ওপারে ছিল! পুরো বোতল নিয়ে ইয়েলো বেলুন বারের কাউন্টার ঘেঁষে ওরা চারজনে বসেছে। নিবারণ নিজে—আর বিমান, সুশীল ভদ্র, অমরেশ পাল। নিবারণ অফিস থেকে বেরিয়ে ওদের ডেকে ডেকে জোগাড় করেছে। ফোন তুলে সুশীলকে বলেছে, এই ফ্রেণ্ডশিপ করবি? চলে আয়। বিমানকে তুলে আনিস। অমরেশকে সেন্ট্রাল এভিন্যুতেই পাওয়া গেছে। ক্রিকেটের টিকিট নিয়ে কি গণ্ডগোল তা ও ভালোভাবেই জানে। কিরকম পিচে কিরকম বোলার চাই—তাও বলে দিতে পারে। সবসময় পার্সোনালিটি কালচার করছে—কখনো গম্ভীর, কখনো নির্বাক, কোমরের সাইজ নিয়ে প্রায় চল্লিশে পৌঁছেও চিন্তা ভাবনা করে। একমাত্র নেশা হলেই ও নর্মাল। তখন অল্পে মাতাল নিবারণের কেয়ারটেকার হয়ে যায়। আসলে অমরেশ শুধু তখনই নিবারণকে ভালবাসতে শুরু করে। অন্তত নিবারণের তাই ধারণা। কেননা, তখন অমরেশ সুশীলের সহায়তায় পানের দোকান থেকে সোডা কিনে জলের অভাবে নিবারণের মাথায়, ঘাড়ে ঢেলেছে। রুমাল বের করে মুছে দিয়েছে। পকেট চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিয়েছে। এরই নাম নিশ্চয় ভালবাসা।

বিমান একদিন বলল, আমরা যে তোর সঙ্গে মিশি—সেজন্য তোর ফি দেওয়া উচিত। ঘণ্টায় অন্তত দু'টাকা—

কথাটা ঠাট্টা হিসেবে বিমান তুলেছিল। শেষদিকে সেটা অভ্যেস হয়ে যায় নিবারণের। তাই বিমান এলেই নিবারণ ওকে ফেরার ট্যাক্সি ভাড়া দিত। একদিন ইয়েলো বেলুনে সন্ধ্যের পর চারজনে জমা হওয়ার ঘণ্টা খানেক পরেই নিবারণ সট্ সট্ তিনটে মেরে দিতেই আউট। তারপর ওয়ার পিকচারের সারজেণ্ট মেজর বার্ট ল্যাংকাস্টার হয়ে গেল।

নিবারণ মেঝেতে শুয়ে পড়ে ডানহাতখানা সাবমেশিনগানজ্ঞানে মুখেই আওয়াজ করে গুলি চালাতে লাগল। সিগারেটের ধোঁয়া,

এয়ারকুলার বসানো বন্ধ ঘর, কাগজে ঢাকা আলোর রহস্যে ইয়েলো বারের খদ্দেররা তখন যে কোন জাহাজের প্যাসেঞ্জার হয়ে গিয়ে দুলছিল। গোলন্দাজ নিবারণ সেখানে একটা এক্সট্রা এনটারটেইনমেণ্ট।

সেদিনটা ভোলার নয়। নিবারণকে সবাই ভালবেসেছিল সেই রাতটুকু। বারের ম্যানেজার ভালো ভালো কথা বলে ওদের বার করে দেবার পর বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া রগে এসে লাগতেই নেশা আরও ধরে গেল। ঠিক হল, সবাই মিলে সোনাগাছি যাওয়া যাক। একটা কিছু করা দরকার এই পুণ্য দিনে—এই পবিত্র ক্ষণে। চারজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। কলকাতা দখল করা উচিত। অথচ বেহাল হয়েও খানিক দূর গিয়েই রাশ টেনে ধরতে হয়। কেননা, পুলিস আছে, পাবলিক আছে। তখন অমরেশ খুব ভালবেসেছিল নিবারণকে। বেড়াল ধরার কায়দায় নিবারণের সার্টের পেছনটা ধরে ওকে খাড়া রেখেছিল। ইংরাজিতে বার বার বলছিল, 'মাই বয়! মাই বয়!'

তিরিশ পয়সার ক্যাপ ব্ল্যাকে কিনতে হল দেড়টাকায়। সোনাগাছির দস্তুর। খদ্দেরের সুবিধা দেখতে হবে বলে ফি' ঘরেই স্টকে থাকে। সুশীলের চেনা জায়গা। প্রথমে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে ভুল ঘরের দরজায় ধাক্কা মেরেছিল। আণ্ডারঅয়ার পরে একটা লোক এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। খালি গা। গলায় সোনার চেন। বিছানা থেকে মেয়েটি নীল আলোর মধ্যেই শুয়ে শুয়ে ডাকলো, ঝগড়ায় যেয়ো না গো। ওরা ওরকম—

নিবারণের খুব ভাল লেগেছিল। কি ভালবাসে। কত মেশামিশি হয় এখানে। ডিপ বন্ধুত্ব চারদিকে।

তখন সুশীল তার চেনা ঘরে কড়া নাড়লো। রাত একটু বেশি। পিতৃশ্রাদ্ধের পর নিবারণের মাথায় কুচি কুচি চুল উঠেছে। বাড়ীর বড় ছেলে। হাতে বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কাঁচা টাকা।

'দোর খুলে দেখো গো কে এসেছে!'

দরজা খোলাই ছিল। ওরা ভেতরে ঢুকতেই মেয়েটি তাকিয়ায় গা ভেঙে দিয়ে বলল, 'ওমা! এ কোন্ রাজকুমার গো। অমন গোমড়া মুখে কেন?' নিবারণকে হ্যাঁচকা টানে গদিতে ফেলে দিয়েছিল। বিছানায় পড়েই ও তখন মেয়েটার ঢাউস বুকে এমন করে নিজের মুখখানা চেপে ধরেছিল—সামনের বড় আয়নায় খাড়া দাঁড়িয়ে সুশীল বলেছিল, 'চাপাকলে জল খাচ্ছে দেখ।' নিবারণও ফাইভ সিক্সে ও ভাবেই রাস্তার টিউবঅয়েল চেপে ধরে জল খেয়েছে।

তখন রেবা আনকোরা বউ।

নিবারণ তাই সর্বক্ষণ ঠাণ্ডা হয়েই ছিল। বিমান পয়লা জানুয়ারি যে-ট্রাউজার পরে—একত্রিশে ডিসেম্বর তা ছেড়ে ফেলে। কোন আণ্ডারঅয়ারের বালাই নেই। ঘরে সবার সামনে ধুলো-ওড়া প্যাণ্টটা খুলে পাটে পাটে ভাজ করে আয়নার পেছনে রেখে দিল। চোখের হাই পাওয়ারের চশমাটা রাখলো টেবিলে। তারপর শুধু সার্ট গায়ে, পায়ের সু না খুলেই জাজিমের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। একজন স্বাস্থ্যবান যুবকের ভারি পেছনটা সার্টের বাইরে বেরিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যে বিমান তার বাঁধানো দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। যেকোন শিশুই বিছানায় মুতে ফেললে জায়গা বদলে এমন কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে থাকে। অমরেশের ব্যক্তিত্ব ফিরে আসছিল। বিমানের পাছা বরাবর লাথি কষাবার জন্যে পা তুলেছে। মেয়েটি দেখতে পেল। নিবারণও পেয়েছে। পায়নি শুধু সুশীল। সে তখনও ডান উরুতে বসিয়ে মেয়েটিকে প্রেমের কথাবার্তা বলছিল। যেমন, 'আমার একটু গলা জড়িয়ে ধরবে?'

'ধরেছি তো।' তারপর, 'আঃ! করছেন কি। ঘুমন্ত মানুষ কি বোঝে!' অমরেশের লাথির নীচেই হাত রাখল মেয়েটি। অমরেশ পা নামিয়ে নিল। সে তখন মেয়েটির আধখানা পেয়েছে। খোলা ঘাড়ে একটা বড়মত চুমো শব্দ করে রাখলো। তার বাকি আধখানা কিন্তু তখনও সুশীলের কাছেই। সেই অবস্থাতেই মেয়েটি খুব আদর

করে বিমানের সার্টের বাইরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, 'রোজ উনি এসে ঠিক ঘুমিয়ে পড়বেন।' মুখে হাসি ছিল, বিরক্তি ছিল, মায়া ছিল। ভাল বাংলায় যাকে বলে প্রশ্রয় ছিল, 'শীতে কাঁপছে যে—পাখা বন্ধ করে দিন।'

অমরেশ দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'না ধ্বজভঙ্গ শা লা।'

আজ নিবারণ জানে, মেয়েটির কত ভালবাসা ছিল। হেভি ফ্রেণ্ডশিপ। কি ভীষণ মেশামিশি করতো। সেই বিমান বিয়ে করেছে। বেশি টেনে টেনে আজকাল প্রায়ই বিছানায় মোতে। পরদিন সারাটা ভোর কেঁচো হয়ে থাকে। ওর বউ গুম গুম করে ছাদে তোষক শুকোতে দিতে ওঠে। একদিন বেলা ন'টা নাগাদ বেড়াতে গিয়ে নিবারণ এই অবস্থায় পেয়েছিল বিমানকে। একটুও মেশামিশি হয় না ওদের। ডাক্তারের কাছেও যায় না।

সারা আদালত এখন তার দিকে তাকানো। হাকিমের ডিক্টেশন নিচ্ছে স্টেনো। রেবা সেকেণ্ড রোয়ের প্রথমেই বসে আছে।

মেয়েটি নয়। মেয়েমানুষটির বয়স হয়েছিল। তখনকার চালু কাপড় কর্ডরয়ের ব্লাউজ গায়ে। সুশীলের টানাটানিতে কমলার খোসা হয়ে খুলে গেল। কাটার পর পাঁঠাখাসির রানের মাংস এমনই ঢিলে ঢালা হয়।

'ছাড়ুন। আসছি এখুনি।'

বারান্দায় চারদিকে ত্রিপলে মোড়া। কোথাও কোন ড্রেন নেই। সেখানে একটা বড় গামলায় পেচ্ছাপ করেই মেয়েটি চলে এল। তখন নিবারণের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। অমরেশ ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, 'একেবারে মেতে গিয়ে কাছা খুলে বসে থেকো না। মনে আছে—ঘোষের ক্লিনিক সাতাশি টাকা পায় কিন্তু—'

অমরেশ বেশিদূর যেতে পারল না। অন্ধকার সিঁড়ি ঘরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো। বাইরে পুলিশ ভ্যান ঘুষের লোভে অতটুকু

পাড়া বারবার চক্কর দিয়ে দিয়ে পিচরাস্তা শুঁকে বেড়াচ্ছে। সুশীল তার স্বভাবমত ভালবাসতে লাগল। গলা জড়িয়ে ধরল, বার বার বলল, 'তোমার কি কষ্ট গো। আমায় বল না। আমি সবাইকে ঢিট্ করে দেব।'

মেয়েটি একটু একটু করে ধরা দিয়েই যাচ্ছিল। হাসছিল। জামা কাপড় ঢিলে দিয়ে রাখছিল আর সুশীল সেসব তুলে তুলে চেয়ারের ওপর রাখছিল।

'আলো থাকবে?'

'থাকুক না।'

মেয়েমানুষটি চোখ দিয়ে নিবারণকে দেখাল।

'থাকুক গে।' তারপর সুশীল নিবারণকে বলেছিল, 'দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে থাক্ তুই।'

সর্বক্ষণ তাই ছিল নিবারণ।

চারখানা পা এক এক ঝাঁকুনিতে ওর পিঠে এসে ঠেকছিল—সুশীল বুক, পেট, চার হাত পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে অন্য একজন মানুষকে যতখানি পারে নিজের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেখতে চাইছিল—কতদূর যাওয়া যায়—কতদূর পাওয়া যায়। একজন আরেকজনের ভেতরে কতখানি যেতে পারে—কতখানি নিতে পারে। বুকে বুক ঠেকিয়েও সবটা পাওয়া যায় না বলে—বাকি থেকেই যায় বলে—লোকে মেশামিশি করে, বন্ধুত্ব কেনে।

ডেভিড আবেল তখনও কাঠগড়ায়। সরকারী উকিল জানতে চাইল, 'তাহলে পাকড়াশি সাহেব শুধু শুধুই গ্লাসে ঢেলে নিয়ে বসে থাকতেন?'

'সাহেব ওরকমই! কখনো আমাদের কাউকে কড়া কথা বলেননি।'

হঠাৎ নিবারণকে প্রশ্ন করল, 'আপনি এসব করতেন কেন?'

নিবারণ চুপ করে আছে দেখে আবার জানতে চাইল।

'কেন আমি জানি না।'

'তা কি হয়!'

'কি করে বোঝাবো বলুন। আর—আমি বললেও কি বুঝতে পারবেন—'

'চেষ্টা করে দেখতাম!' আদালত ঘরে সংক্রামক হাসি কিছু গাড়লের গালে মুখে খেলে গেল।

'ভালো কথা।' মুখ দেখে রেবা বুঝলো নিবারণের এবার জেদ চেপে গেছে।

'হুজুর। আমি সারাদিন টাকা কামাতাম। লোক পেতাম না। আসল লোক। কলকাতায় বাগান চোখে পড়ে না। শহরের মাঝখানে নদী নেই। কারও উঠোনে ভোর রাতে পাখি নেমে আসে না। কোন রিলিফ নেই কোথাও। লোকের ক্রিয়াকর্ম আড়াল করার জন্যে এখানে শুধু ঘর আছে বাড়ি আছে—সাবানের দোকান আছে। ঘুম বাদ দিয়ে হুজুর বাকি সময়ের সবটাই শুধু বিফলে যায়। কেউ কারও বুকের ভিতরকার রক্ত চলাচল জানি না। হার্ট বলুন হুজুর—হৃদয় বলুন—কিংবা আত্মা—তার কি রং আমরা আজও জানি না—আমরা মেশামেশি ভুলে গেলাম হুজুর।'

শশধরের মুখ হাসিতে ভরে উঠেছে। সে তো ওই পথেই নিবারণকে নিয়ে যেতে চায়। একবার আদালত বুঝুক—নিবারণ পাকড়াশি কতখানি আনসাউণ্ড মাইণ্ডের লোক।

'সেজন্যেই আপনার উপকারী কলিগ—বস্ অনিল দত্তের বুক বরাবর নিখুঁত ভাবে টেবল্ ফর্ক বসিয়ে দিলেন। রাইট চেম্বার থেকে ব্লাড লিক করে হার্টের ভালভে হাওয়া ঢুকে গেল। পোস্টমর্টেম তাই বলে—'

এখানে শশধর উঠে দাঁড়াল। এসব জেরার উসকানিতে নিবারণ কনফেস করে বসবে।

ভাগ্য ভাল। নিবারণের মনে তখন স্বাস্থ্য বইয়ের রঙীন ডায়াগ্রামটা ভেসে উঠেছে। বাম অলিন্দ, দক্ষিণ অলিন্দ—বুকের ভেতরে রক্ত পাম্প করে। সে কোন্ ক্লাস এইটের বইতে পড়েছিল।

একবার অনিলদার সঙ্গে নোয়ামুণ্ডি মাইনসে বেড়াতে গিয়েছিল। পৌষ মাস। বাংলোর বাইরে আউট হাউসের গায়ে বাগানের মালি বুড়োন সিং বেঁটে মত একটা কদম গাছে জাল পেতে রেখেছিল। রাত দশটা বাজতেই জ্যোৎস্না বেরোলো। জালে বুনো বাদুড় ধরা পড়েছে একজোড়া। হ্যাজাক জ্বালিয়ে বুড়োন কাটাকুটি করল। তারই আগ্রহে নিবারণ আর অনিল বাদুড়ের মাংস খেয়েছিল। সত্যি তুলনা হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্য অত কালো জিনিসের ভেতরটা কি গাঢ় লাল। হ্যাজাকের আলোয় নীল পিত্ত ঝক ঝক করে উঠেছিল। আধকাটা-গলা সুদ্ধ চোখ পিট পিট করে বড় বাদুড়টা নিজেরই ডানা কাটার ব্যাপারটা দেখছিল নিবিষ্ট মনে। কি সখ্যতা মানুষের সঙ্গে। কত বন্ধু। তিনটে মানুষ ওদের খাবে বলে শেষ মুহূর্তেও অধৈর্য হয়ে নড়াচড়া করেনি। ছোটোটা ওর চোখের সামনেই নিকেশ হয়েছে।

বাম অলিন্দ দক্ষিণ অলিন্দে ওরকম লাল তরল রক্ত চালাচালি করে। নিবারণ জানে তখন মানুষের ভেতরে দপদপ করে।

শেষরাতে ঘুম ভাঙলো। মেয়েটিই বলা যায়। ভোরবেলার ফিকে আলোয় অন্য ঘরের দু' তিনটি মেয়ে এসেছে। সবাই শুধু কাপড় গায়ে—ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। একজন বাগনানের সার্বজনীন দুর্গাপুজোর বিল বই মেলে ধরল, 'দাদা চাঁদা চেয়ে রাখতে বলেছে।' সুশীল ওদের মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে বসে। অমরেশ কোণে বসে বিমানের প্যাণ্ট দিয়ে সু ঘসে চকচক করে নিচ্ছিল। এমন সময় মগ হাতে ঢং ঢং করে বিমান ফিরে এল। একেবারে গত রাতের মূর্তি —পায়ে সু, গায়ে শুধু সার্ট। সুশীল 'হো হো' করে হেসে উঠল।

'একফোঁটা জল নেই সারা বাড়িতে?'

'ভারি আসবে খানিক পরে। বসুন না।'

'এক মিনিটও থাকব না এখানে—,' বলতে বলতে বিমান অমরেশের হাত থেকে ছোঁ মেরে প্যাণ্টটা নিয়ে পরে ফেলল। তখন ফ্ল্যাটবাড়ির বারোয়ারি সিঁড়ি দিয়ে বছর পঞ্চান্নর একজন বাঁধাবাবু মাপা পা ফেলে নামছিল—সার্জের পাঞ্জাবি, গলায় মাফলার, কাঁচাপাকায় মেশানো পাকানো গোঁফে ভোরের রোদ পড়ে নানা রঙে রঙীন লোকটা টেকনিকালার হয়ে গেল।

সেই ভর্তি জায়গায়, থৈ থৈ ভালবাসার মাঝখানে সুশীলকে রেখে ওরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে বিমান কাট। যেখানে জল আছে ওকে এখন সেখানে যেতেই হবে।

অমরেশ শেয়ালদার কাছে নিবারণকে ছেড়ে দিল।

এখন কোথায় যায়। নিবারণ কোনদিন ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়েনি। এখন বাড়ি ফেরার মানেও হয় না। কতকাল পরে আবার ছাড়া-গরু হবে। রেবা, অফিস, পেট্রল বিল, চালান, কোটেশন—কত কি দিয়ে অল্পদিনের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে।

ঠিক প্ল্যাটফর্মে এসে পেটে মোচড় দিয়ে বমি এল নিবারণের। টিকিট কাটা হয়ে গেছে নৈহাটির। সেখানকার প্ল্যাটফর্মে নেমেই আবার ফিরে আসবে। সুশীল বলেছিল, 'বমি ভাল সিমটম। লভার তাজা আছে বলেই, লিকার রিফিউজ করছে। যেদিন বমি হবে না সেদিন থেকেই ভয়।'

ট্রেন ছাড়তেই নিবারণ দৌড়ে গিয়ে গার্ডের কামরায় উঠলো।

'আমি নিরুপায় স্যার। অন্য কামরায় উঠলে এই অবস্থায় পাবলিক নামিয়ে দেবে—', গার্ড ভাল করে দেখল নিবারণকে, 'এত সকালে দোকান খোলে?'

তখন আর কথা বলার উপায় নেই। ভক্ করে বমি উঠে আসায়

নিবারণের গাল ভর্তি হয়ে গেল। জানলাটা ছেড়ে দিয়ে গার্ড সাহেব সরে এল, 'বাঁ দিক ঘেঁষে হাওয়ার সঙ্গে করুন। মাথা বেশি এগিয়ে দিচ্ছেন কেন? পোস্ট আছে—'

লোকটা তখন খুব আদর করে নিবারণকে কোমরে ধরে ভেতরে টেনে আনছিল। যদি পোস্টে ধাক্কা খায়। সকাল বেলার আলোয় কলকাতার বাইরেই লোকে যে যার মত কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে।

তখন কত ভালবাসা ছিল।

এই একটা ব্যাপার নিয়েই তো সবকিছু।

'তাইতো ব্লাড লিক করে হার্টের ভালভে হাওয়া ঢুকে গেল—'

সরকারী উকিল ওকে ছাড়েনি।

নিবারণ বলল, 'তাতো যাবেই। ওদিকেই কি 'সোল' থাকে না বুকের ঠিক চার আঙুল নীচেই—'

'সোল?'

'চেনেন না? যাকে বলে থাকেন আত্মা—নীল রঙের—'

শশধর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে আর কি। দায়রা জজ নড়ে চড়ে বসেছে। পাবলিকের একজন নীচু গলায় বলে বসল, 'লাও বাবাঃ সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ লক্ষ্য করে নিবারণ পাবলিকের দিকে খচ্ করে ঘুরে দাঁড়াল। কোর্ট ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়াল। রেবা তার চেয়ারে কাঠ হয়ে গেছে।

এইতো চাইছিল শশধর। নিবারণ পাকড়াশির বাঁচার রাস্তা এখন একটাই। আলতু ফালতু বলে সে যদি এখন বোঝাতে পারে, চিন্তা ভাবনায় গণ্ডগোল আছে—তার মন অনিশ্চিত, অস্থির—তবে মক্কেলকে সে ডাঙায় তুলতে পারবে।

'আত্মার রঙ নীল—একথা আপনি কোথায় পেলেন?'

খুব গোপন তথ্য জানার ভঙ্গীতে নিবারণ একগাল হেসে ফেলল,

'তা কি করে বলি আপনাকে !'

'আপনি হলফ নিয়েছেন—'

'শুধু সত্য—সত্য বই অন্য কিছু বলব না—'

'তবে ?'

'এসব তো সেই—'অন্য' কথা। আর, বললেও কি আপনি মানে বুঝবেন ?'

আদালত ঘরের ভেতরে প্রায় সবাই একই সময়ে হাসি চাপতে গিয়ে ফেল করল।

॥ ৫ ॥

চিত্তরঞ্জনে তখনও ইনজিন তৈরি শুরু হয়নি। ভিলাই, রাউরকেলা, দুর্গাপুর নেহরুর স্বপ্নের আঁতুড়ে। এখনকার বোকারো তখন ফাঁকা মাঠে চুয়াল্লিশখানা গ্রাম। ইস্পাতের বাজারে টাটা, বার্নপুর একচ্ছত্র। সেই সময় জগন্নাথদাস আর বদ্রীদাস মিলে দিল্লীতে ঘোরাঘুরি করে টাটা, বার্নপুরের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে তিন তিনখানা ক্যানাডিয়ান ইনজিনের তাবৎ চাকা ঢালাইয়ের অর্ডার নিয়ে এল।

তার আগের বছরেই দি গ্রেট ন্যাশানাল আয়রন ঢালাই কারবারের শৈশব কিউপোলা ফারনেসের আমল পার হয়ে সবে একটি বেসিমার ফারনেস বসিয়েছে। তাপ্পিমারা সেই ওপেন হার্থ ফারনেসে যে ইনজিনের চাকা ঢালাইয়ের হেভি কাস্টিং—হাই-ম্যাঙ্গানিজ স্টিল গালানো যেতে পারে—এখনকার মেটালারজিস্টরা তা দেখলেও বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু তাই ঘটেছিল।

সেই অসাধ্য সাধন করেছিল অনিল দত্ত। পুরো ব্যাপারটা নিবারণ পাকড়াশির চোখের সামনেই ঘটে।

একবার চিন্তা করুন—পুরীর সমুদ্রের ঢেউ আর বাড়ির পুকুরের জলে হাওয়ার চোটে বীচিভঙ্গ। কোথায় টাটা-বার্নপুর আর কোথায় দি গ্রেট ন্যাশানাল আয়রন—

কিন্তু তাই হয়েছিল।

বাজারে লোহার দর নেই। তখন কোথায় ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যে, সরকার কেনাকাটা শুরু করবে। বাড়িঘর তৈরির ফাইভ-এইট রড, রেন ওয়াটার পাইপ আর কড়াই তৈরি হচ্ছে গুচ্ছের। কিন্তু বড় বড় ঢালাই কে করাবে? জগন্নাথদাস-বদ্রীদাস ওপেন হার্থ

ফারনেস বসিয়েছে ঠিকই। কিন্তু অতবড় রাক্ষসের আহার যুগিয়ে থৈ পাচ্ছে না বাজারে। তাই ফারনেসের নামে কেনা স্ক্র্যাপ আয়রন বাঁ হাত দিয়ে জাপানকে ঝেড়ে দিয়ে দু'পয়সা করছে। জাপানে লোহার ল নেই। আর এদিকে চোখে ধুলো দিতে নামকে ওয়াস্তে ফারনেসের ধুনি জ্বালিয়ে রেখেছে। সেখানে মাঝে মধ্যে ইস্পাত গালানো হয় ঠিকই। কিন্তু কয়েক টন ইনগট ঢালাই করেই টানা যোগনিদ্রা।

কোন প্রেজেণ্ট নেই—ফিউচার নেই। সব সময় আগুন জ্বলছে। চুনোপাথরের পোড়া চুন হাওয়ায় উড়ে এসে নিবারণের গায়ের ঘামে মিশে গিয়ে চুলকোতো। কাজ শিখেছে—কিন্তু যাবার জায়গা নেই। সেই সময় অনিল দত্তর আগমন। বি এস-সি পাস নিবারণের বয়স তখন বছর পঁচিশ। সেসব দিনে ঢালাইঘরের লোকজনকে টাইম অফিসের ঢোলবাবুও যাচ্ছেতাই করে কথা বলত। কেননা, কোন প্রোডাকশন নেই বলতে গেলে একরকম—তারপর ফারনেস উঠে যায় কি না তার ঠিক নেই। একাশি টাকা মাইনেয় নিবারণ পাকড়াশি তখন এক নম্বর ফারনেস হেল্পার। মনে মনে আশা, কাজ শিখে টাটায় কেটে পড়বে।

অনিল দত্ত এল। নানান্ ঢালাইয়ে অনেককালের কারিগর—গায়ের রঙটা কিন্তু একদম জ্বলে যায়নি। বুক পকেটে কালো সুতো জড়ানো নীল ফাবনেস গ্লাসের অনেকটাই বেরিয়ে থাকত।

প্রথমে ক্যানাডিয়ান ইনজিনের সামনের তিনখানা চাকার ছাঁচ তৈরি হল। কিন্তু মুসকিল দেখা দিল—একবারে পুরো একটা চাকা ঢালাইয়ের মাল গরম গরম অবস্থায় একটা ল্যাডেলে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না।

হাতেখড়ি কিউপোলা ফারনেস দিয়ে—যুদ্ধের সময় ইছাপুরে দশটনের ইলেকট্রিক ফারনেসেও কাজ করেছে অনিল দত্ত। এসব কথা তার মুখেই পরে শোনা। টাটায় জায়গা পায়নি একদা।

অভিমান আছে। পরে ডাক পেয়েও যায়নি। ডাক আরও এসেছে। সরকারী কারখানাগুলোও টোপ ফেলেনি যে তা নয়। কিন্তু জীবনের শেষদিন অব্দি জগন্নাথদাস-বদ্রীদাসকে ফেলে কোথাও যাওয়ার কথা আর ভাবেনি অনিল। অবশ্য দু' তিনখানা অ্যাপায়েণ্টমেণ্ট লেটার সব সময়ই হিপপকেটে থাকত অনিল দত্তর। শোনা কথা, একবার নাকি কথা কাটাকাটির সময় বলেছিল, 'জবস্ আর বেগিং মি।' হতে পারে। স্টিল মিনিস্ট্রির অ্যাডভাইসরি কমিটিতে বেসরকারী সদস্য হিসেবে দু'বার রাশিয়াও ঘুরে এসেছে। একবার তো কিউবায় একটা মাঝারি সাইজের ফারনেস বসানোর জন্য ডাকও পড়েছিল। অনিল দত্ত যায়নি। হংকংয়ের এক ব্যাটা ইলেকট্রিক ফারনেসের মালিক ঝুলোঝুলি। হংকং-ডলারের মোটা মাইনে টাকায় ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা করে দিতেও রাজী ছিল সে।

যায়নি। কেননা, গ্রেট ন্যাশানাল আয়রনে তার কথাতেই সূর্য উঠতো, ডুবতো। তার জন্যেই গ্রেট ন্যাশানালের সামান্য অবস্থা থেকে আজ এত রবরবা। গ্রেট ন্যাশানালও তাকে খুব দেখত।

শেষদিকে অনিল দত্ত প্রায় সব কাজই দেখত। ছোটখাটো মানুষটি তীরের ফলা হয়ে সারা কারখানা ছুটে বেড়াত। রোলিং মিলে গিয়ে রি-হিটিং বেসে দাঁড়িয়ে রোলিংয়ের সময় গাঁজায় দম দেওয়ার ভঙ্গীতে সিগারেট টানতো। শেষদিকে সেই সিগারেটও ছেড়েছিল অনিল। সেলস্ ফোর্সকে ঢেলে সাজাতে জীবনের শেষ তিন চার বছর অনিল দত্ত সেলস্ ম্যানেজার হয়েছিল।

ওসব কথা থাক। যা হচ্ছিল—

ক্যানাডিয়ান ইনজিনের চাকা ঢালাইয়ের দিন তিনেক আগে নিবারণ একটা পরামর্শ দিল। খুব একটা কিছু ভেবে অবশ্য দেয়নি। কিন্তু আইডিয়াটা ক্লিক করল। ঢালাইয়ের মোল্ডের কাছাকাছি টেম্পোরারি রি-হিটিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হল। জোড়া ল্যাডেলে গরম গরম ইস্পাত এনে গলন্ত মাল ছাঁচে ঢালা হল। টেম্পারেচার

মেইনটেন করে দিব্যি ঢালাই হয়ে গেল। সেই থেকে নিবারণ অনিলের কাছাকাছি। অনিলের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফারনেস থেকে স্যাম্পেল নিয়েছে নিবারণ। সিলিকা প্লেটে তরল ইস্পাত ঢেলে দিয়ে ফুলকি দেখে বুঝতে শিখেছে—কতটা কারবন? কতটা ম্যাঙ্গানিজ?

সেই তাপ্পিমারা ওপেন হার্থ ফারনেসে তিরিশ টন ইস্পাত তরল হয়ে ফুটছে। গ্যাসপিট থেকে কারবন মনোক্সাইড্ এয়ার প্রেসারে মাটির নীচের ব্রিক চেমবারে ঢুকে ত্রিগুণ গরম হয়ে ফারনেসে এসে ঢুকছে। এক একদিন ফারনেস ডোর তুলে নিবারণ স্ল্যাগ ঘেঁটে দেওয়ার সময় দেখেছে, কারবন মনোক্সাইড্ কিভাবে তরল ইস্পাতের ওপরে পড়ে নীলচে আগুনের জিভ দিয়ে স্ল্যাগ, আধপোড়া পিগ আয়রন, স্ক্র্যাপ গালিয়ে দিতে দিতে এগঝস্ট্ চেমবারে ঢুকে পড়ছে। তখন একরকমের আনন্দ হত। এই বিপুল কাণ্ডকারখানায় শ' পাঁচেক লোক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ করে যায় বলেই—ডলোমাইট, লাইমস্টোন, পিগ আয়রন, স্ক্র্যাপ, কারবন, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, ফসফরাসের মাত্রা মাফিক মিশেল দিয়ে ছাঁটাই করে তরল ইস্পাত হয়—মোল্ড থেকে আনকোরা ইনগট বেরিয়ে আসে।

এক একদিন টেম্পারেচার কনট্রোল করা কঠিন হয়ে পড়ত। অতিরিক্ত তাপে ফারনেস রুফ থেকে সিলিকা ব্রিক গলে গলে খসে পড়ে ইস্পাত রান্নায় গণ্ডগোল করে দিত। তখন অন্যরকম অনিল দত্ত দেখা দিত। সার্টের হাতা গুটিয়ে নিবারণকে বলত, 'তিনটে ফারনেস ডোরই তুলে দাও।'

ফারনেস বেডে তখন দাঁড়াবার উপায় নেই। সাড়ে সাতশো থেকে আটশো, আটশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ইস্পাত ফুটছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ব্রিক-চেমবার থেকে কারবন মনোক্সাইড বেরিয়ে এসে সেই ইস্পাতেই ঝাঁপ দিচ্ছে অনবরত। তখন ফার্স্ট হেলপার নিবারণ পাকড়াশি, স্যাম্পেল পাসার আউধরাম, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মেস্টার সরযূপ্রসাদ—সবাইকে অনিল দত্তর পেছন পেছন চোখে ফারনেস গ্লাস

এঁটে বেলচায় গুঁড়ো ডলোমাইট বোঝাই দিয়ে দাঁড়াতে হত। অকথ্য গরম আর উড়ে বেড়ানো পোড়াচুনের মধ্যে শুরু হয়ে যেত গ্রুপ ডান্স।

ফারনেসের ছাদে যে জায়গায় সিলিকা গলে খসে পড়েছে—সেখানটা মেরামত করতে হবে। অনিল সবার আগে এগিয়ে গিয়ে রুদ্ধ, তরল ইস্পাতের প্রায় তিন হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাতের এক বিশেষ মোচড়ে এক বেলচা গুঁড়ো ডলোমাইট সাঁ করে ফারনেসের ছাদের সেই নরম জায়গায় ছুঁড়ে দিত। সঙ্গে সঙ্গে তা সেঁটে যেত। অনিলের হাতের ভঙ্গী লক্ষ্য করে নিবারণও অমনি ছুঁড়ে দিত। এইভাবেই সবাই। কোন থামা নেই। বিশ পঁচিশ মিনিট এক নাগাড়ে জনা আট দশ লোক এভাবে ঘুরে ঘুরে বেলচায় ডলোমাইট বোঝাই দিত—গলন্ত ইস্পাতের সামনে গিয়ে ছাদ বরাবর তাগ করে ছুঁড়ে দিত। ডলোমাইটের একটি কুচিও ইস্পাতে পড়তে পারবে না। বেলচা ডান্সের শেষে অনিল গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফারনেস গ্লাস চোখে লাগিয়ে ইস্পাতের মর্জি বুঝতে চেষ্টা করত। এক একদিন নিবারণের সন্দেহ হয়েছে, অনিলদা বোধ হয় পাকা রসুইয়ের কায়দায় ইস্পাতের গন্ধ শুঁকে তবে ফারনেস ট্যাপ করে—গলন্ত ইস্পাত নামানোর অর্ডার দেয়। একেবারে যজ্ঞিবাড়ির রান্না! তবে মশলা-পাতির ঠিক ঠিক মিশেল চাই।

যজ্ঞের চরু রান্নার কাঠকুটো কুড়িয়ে আনতো ঋষি বালকরা। গোড়ায় গোড়ায় নিবারণেরও কাজ ছিল প্রায় তাই। শেষে হাত পাকিয়ে ফেলেছিল। ততদিনে অনিল দত্ত জগন্নাথদাস-বদ্রীদাসের হাল ফিরিয়ে দিয়েছে। বাঁ হাত দিয়ে স্ক্র্যাপ আর জাপানকে বেচতে হয় না। দি গ্রেট ন্যাশানাল আয়রন আরও একটা ফারনেসের ইরেকশন শুরু করে দিয়েছে। রেল ছাড়াও ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের অর্ডার আসছে। ঢালাই করে করে, ওভারটাইম, হিট-অ্যালাউন্স, প্রোডাকসন বোনাস নিতে নিতে অনেকেরই টাকার অঙ্ক গোলমাল

হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। দুর্গাপুরে সবে ইস্পাত বেরোতে শুরু করেছে। ততদিনে নিবারণ পাকড়াশি ডবল প্রোমোশন পেয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

কলকাতার সেলস্ অফিসে নিবারণকে টেনে আনার কিছুদিন পরে একদিন ৮/৯ স্টোনের ছোটখাটো মানুষটি ম্যাঙ্গো লেনের সরু গলিতে গাড়িতে উঠছে—এমন সময় নিবারণ তার সামনে পড়ে গেল।

অনিল দত্ত রাস্তায় দাঁড়িয়েই নিবারণকে বলল, 'আমি তোমায় রেসপেক্টেবিলিটি—প্রেসটিজ দিলাম—', বলতে বলতে গাড়িতে উঠে গেল। চলতি গাড়ির জানলায় বসে বলল, 'গ্র্যাণ্ডে লাঞ্চ আছে। ইউ এস স্টিল ডেলিগেশনের সঙ্গে খানা খেতে হবে। কেমন দেখাচ্ছে বলত আমায়?'

ড্রাইভার স্টার্ট নিয়েও থেমে আছে। সাহেবের মেজাজ বুঝেই ও হর্ণ দেয়, ক্লাচ চেপে থাকে, গিয়ার বদলায়। এসব নিবারণের জানা। বাই-রোডের লম্বা পাড়িতে অনিলদার সঙ্গে বেরিয়ে বেরিয়ে এসব জেনেছে নিবারণ।

'কিং অব কিংস!'

'যাঃ!'

'সত্যি!

বিকেলে আমার ঘরে এসোতো একবার।'

গাড়ি বেরিয়ে গেল। পেছনের কাচ ভেদ করে কলকাতার ওপরের সূর্য অনিলদার ঘাড় ছুঁয়ে ছিল। টাই লটকানো ঘাড়ের যেটুকু বেরিয়ে—যে কোন সুখী ষাঁড়ের গর্দানের সঙ্গেই একমাত্র তার তুলনা চলতে পারে। প্রতিটি শিরা-উপশিরায় পূর্ণবেগে রক্ত চলাচল করে নিবারণের। সব সময় ফুলস্পীডে জোড়া সিঁড়ি টপকে টপকে অনিলদা তখন বেরিয়ে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে, উঠেও যাচ্ছে।

বোকারো নিয়ে আমেরিকা তখন টালবাহানা করছিল। কথাবার্তা চালানোর জন্য কেনেডি একদল এক্সপার্ট পাঠিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ভোজ খেতে অনিল দত্ত বেরিয়ে গেল। এই লোকটির ঢালাই শুরু হয়েছিল—কিউপোলা ফারনেসে। সেখানকার ফিনিস্‌ড্‌ প্রোডাক্ট ছিল রট আয়রনের কড়াই, রেন ওয়াটার পাইপ!

অনেকদিনের জানাশুনো, কাছাকাছি মানুষের যেমন হয়—চোখে চোখে কথা হয়ে যায়, পাশের ঘরের চেয়ার টানার আওয়াজ শুনলে বোঝা যায়—আরেকজন তখন কি করছে, কি ভঙ্গীতে সিগারেট ধরে বেয়ারাদের কার্পেট বিছিয়ে দিতে বলছে—ঠিক তেমনই নিবারণ আজকাল অনেকদিন দেখা না হলেও বুঝে ফেলে অনিলদা কেমন আছে—কি করছে।

ছত্রিশ সাঁইত্রিশের অনিলকে সে প্রথম দেখে। এই ক'বছরে অনিল মাড়ির তিনটি দাঁত তুলেছে। কতদিন নিবারণ বলেছে, ড্রিংকস্‌ বেশি হয়ে গেলে রাতে শোয়ার আগে কুলকুচি করে নেবেন। একটা কথাও অনিল শুনবে না। চালশে ধরে থাকবে। ইদানীং কোটেশন কিংবা ড্রয়িং দেখবার সময় একটা সোনালী খাপ থেকে চশমা বের করে পরে নেয় অনিলদা। আউট অব ডেট এক ছোপ গোঁফ—নিবারণের সন্দেহ আঠা দিয়ে লাগানো—ভারি গালে ঠিক নাকের নীচেই বসানো। এখন নিবারণ জানে, এঁরাই বড়ুয়ার 'গৃহদাহ' দেখে মেসে খেতে বসে অন্যমনস্ক মহিমের পোজে বামুনের কাছে ডাল চাইত। সেই তখনকার যুবক অনিল দত্ত এখন চুল ছাঁটলে যতটা পারে উঠিয়েই ছাঁটে। বছর দুই হল আদ্দির পাঞ্জাবীতে ভীষণ নিষ্ঠুর লাগে।

অথচ এই মানুষটিকে কয়েক বছর আগে মেল্টিংশপে তিরিশ টন গলন্ত ইস্পাতের সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালে ঢালাও ফারনেস বেডের তাপে, ভাপে, ঝাপসা আলোয় শ'পাঁচেক লোকের বিরাট কর্মকাণ্ডে—বেলচা ডান্সের ডান্স মাষ্টার মনে হত। যতই ফারনেসের দিকে এগিয়ে যেত

—অনিলদার ছোটখাটো অবয়বটুকু কালো, অন্ধকার, ছোট হয়ে গিয়ে তার চারদিকে তরল ইস্পাতের ছটা আলো হয়ে ঠিকরে পড়ত। তখন নিবারণের পক্ষে অনিলের গায়ে পোড়া চুনের গুঁড়ো দেখে বিভূতি ভেবে বসলেও কোন দোষ ছিল না।

সেই অনিল বলল, 'আমি তোমায় প্রেসটিজ দিলাম।' আরও বললে পারত, 'যাও খোকন মন দিয়ে কাজ কর।' কিংবা জানতে চাইতে পারত, 'নিবারণ—আজ ভোরে তুমি সেই পদ্যটা রিডিং পড়েছ ?'

'কোন্‌টা অনিলদা ?'

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।'

এই অনিলদা ইদানীং হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পর টুথ পিক দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুচিয়ে খুচিয়ে দাঁত থেকে মাংসের কুচি বের করে—তবে ওঠে।

আমি তোমায় প্রেসটিজ দিলাম। আজকের এই কথায় নিবারণের সারা শরীর কালো হয়ে গেল। অনেকদিন আগেই তার একটা কান একবার কালো হয়ে যায়। সে বার বার চিন্তা করল, তাহলে পৃথিবীতে এমন লোক আছে যে, ইচ্ছে করলেই অন্যকে গৌরব, মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি দিয়ে দিতে পারে এবং সেসব দিলে তাতে ভূষিত হওয়াও উচিত। প্রেসটিজ, রেসপেক্ট—এসব আয় করা যায় না ? লোকে লোককে দেয়। হা ভগবান। তাহলে মিরাক্যাল কোথায়। দৈব আসলে ফুঃ !

তক্ষুনি নিবারণ বুঝতে পারল, আমি এতকাল যে মনে করে এসেছি—একাগ্রভাবে কাজ করে আমি আজ এখানে, অনিলদা আজ ওখানে—কিংবা সুরেন বাড়ুজ্যে তিরিশ চল্লিশ বছর হল কার্জন পার্কে—তা ঠিক নয়। কোন কোন লোক জীবনে আমাদের এইসব জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে মাত্র !

বিকেলের আর কিছু বাকি ছিল না। বেয়ারা এসে খবর দিল, 'সাহেব ডাকছেন।'

ইনটারনাল ফোন দিন তিনেক খারাপ হয়ে আছে।

পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখল—অনিলদার ঘর এখন ফুল হাউস হয়ে আছে। রিটেইল আয়রন এ্যাণ্ড স্টিল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিমাংশু বোস, ফিল্ড অরগানাইজার মণি রায়, দি গ্রেট ন্যাশানাল আয়রনের টেকনিক্যাল ম্যানেজার সি এইচ পাণ্ডে—রোজকার মত প্রায় সবাই আছে। একজন মহিলার মাথা, বেণী পেছন দিক থেকে চোখে পড়ল।

'কে?'

আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। নিবারণ ঘরে ঢুকলো।

'হোয়াই ডু ইউ পিপ লাইক এ টরটয়েজ?'

নিবারণ বুঝলো, আজকের লাঞ্চে অনিলদা ভালো মন্দ খেয়েছে। চ্যাপ্টা চোয়াল, গর্দান মাংসে থকথক করছে। এটা বুঝতে পারল না, অনিলদা আজ কি নিয়ে আলোচনা করছিল। অফিস ভাঙার শেষে রোজ বিকেলে এই মজলিশে এক একটা টপিক ওঠে, কোনদিন আলোচনা হয়, দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় অব্দি রাস্তার দু'ধারে ঝকঝকে কারখানায় কেমন ভরে গেছে—কিংবা ন্যাশানাল হাইওয়ে নামবার ২২ জলগাঁও স্টেশনের গা ঘেঁষে কেমন সুন্দর এক দৌড়ে অজন্তা অব্দি ছুটে গেছে। কোন কোনদিন, ভারত সরকারের স্টিল পলিসির আলোচনা হয়। আয়রন ওর টনে দু'টাকা লস দিয়ে জাপানকে বিক্রি করা কতখানি খারাপ এই প্রশ্নে অনিলদা একদিন নাগাড়ে চল্লিশ মিনিট বলেছিল। সেই সময় মজলিশের সদস্যরা চোখের পলক না ফেলে আগাগোড়া অনিলদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'আমাদের স্কুলে থাকতে শিখিয়েছিল—কারও ঘরে ঢোকার আগে বলতে হয়—মে আই কাম ইন—'

'অবসলিট ! কোন্ স্কুলে পড়েছিলে ?'

'খুলনা জেলা স্কুল। এক কম্পাউণ্ডে ছ'টা ইলেভেনসাইডেড্ ফুটবলগ্রাউণ্ড ছিল।'

'স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা কোরো না। কুইয়ার কথা বলে ইমপ্রেস করতে চাও। হেয়ার ইজ এ সারপ্রাইজ ফর ইউ।'

রীতিমত অবাক হওয়ার কথা। মাখনের বউ লতা চৌধুরী। ওরা বর বউ দু'জনেই নিবারণ আর রেবার বন্ধু—অনেককালের আলাপ। লতা সায়ান্স গ্রাজুয়েট হয়ে কসবায় কোন্ স্কুলে পড়াত। মাখন ইস্টার্ন রেলে ফ্লাইং টিকিট চেকিং স্কোয়াডে আছে। একবার শীতকালে লালগোলার প্ল্যাটফর্মে তার সঙ্গে দেখা হয়। তিনটে সেণ্টেন্সের পরেই বলেছিল, 'শীতে আমরা দু'টো করে গরম ইউনিফর্ম পাই।' সে বছরই নিবারণ শেয়ার নাড়াচাড়া করতে শেখে।

'তুমি ? লতা ?'

'তোমাদের এখানে ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে এলাম।'

কিছু বলা উচিত এখন। নিবারণ বলল, 'ভালই হল।'

তখন অনিলদা তার পেট সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছে।

'এই যে নিবারণ বাবুদের জেনারেশন—কেউ আর তেমন তরুণ নেই—নাক টিপলে তবু কারও দুধ বেরোলেও বেরোতে পারে। এঁরা বলবেন—স্টিল মেল্টিংয়ে ফিজিক্যাল টেস্টের আর দাম নেই। অথচ আমরা এতকাল স্যাম্পেল দু'টুকরো করে গ্রেইনস্—দানা দেখেই তো বলে এসেছি—কারবন কতটা আছে—ম্যাঙ্গানিজ কম কিনা—'

লতা বলল, 'তবু স্পেশিফিকেশনের প্রশ্ন তো আছে। তখন ?'

বাধা পেয়ে অনিলদাকে থতমত খেয়ে যেতে দেখে নিবারণ সমেত ঘরের আর সবাই কিছু অবাক হল। এমন তো কথা ছিল না। এমন তো নিয়ম নেই।

'অর্ডার মত ঢালাইয়ের কেস অবশ্য আলাদা।'

বাগ আপ লতা। কিন্তু অনিল দত্তর জন্য নিবারণের কষ্ট হল।

এ কথা সবাই জানে মানুষটা ফেলনা নয়। বইয়ের যদি পোকা থাকতে পারে—তবে অনিলদাও ইস্পাতের পোকা—বরং বলা ভাল স্টিল উইজার্ড।

অনিলদা আজ দশ বারো বছর তোমায় আমি চিনি। তুমি কখন কিভাবে স্মার্ট হতে চাও কিংবা মনের ভেতরে তোমার বিবেক যখন তোমাকে ভদ্র, বিনয়ী করে তুলতে চায়—তখন তুমি কি কি কর—তা আমার নখদর্পণে। কিন্তু আমি ত এখনও জানি না, কেমন করে লতা এখানে এল—কি করে জানতে যে, লতাকে আমি চিনি। এটুকু আমার জানার কথা ছিল।

অনিলের অনেক কথাই নিবারণ জানে।

ওপেন হার্থ ফারনেসে এক একদিন নাইট সিফ্‌টে ঢালাইয়ের গণ্ডগোল হলে অনিলদা ছুটে আসতো। সারা রাত ধরে ম্যাগনেটিক ক্রেনকে অনিলদা হাত নেড়ে ডিরেকসন দিত—'আড়িয়া। হাফিজ।' আড়িয়া বলে হাঁক দিলে ক্রেনড্রাইভার জগদ্দল ইলেকট্রিক চুম্বক ধপাস করে পিগ আয়রন নয়ত স্ক্র্যাপের গাদায় ফেলত। 'হাফিজ' বলতেই টনখানেক মাল চুমু দিয়ে টেনে ওপরে উঠে যেত ক্রেন। এক একদিন দৌড়ঝাঁপের পর অনিল আর নিবারণ গিয়ে ফারনেসের মাথায় চেকিং টাওয়ারে দাঁড়াত। কত কথা হয়েছে তখন। তারা মুদে গিয়ে রোদ বেরোনোর তখনও হয়ত ঘণ্টা দেড়েক বাকি।

একদিন অনিল তার ছোটবেলার এক শেষ রাতের কথা বলল। সরস্বতী পুজোর ভোরে ক্লাস নাইনের অনিল ফুল চুরি করতে ঢুকেছিল এস ডি ও-র বাংলোয়। মফঃস্বল টাউন। প্রাণ ভরে চুরি চলছে। তখনও ভালো অন্ধকার। সপাং করে পিঠে চাবুক পড়ল। 'ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি এস ডি ও-র ফিটফাট মেয়েটা ঘুম চোখে ওর বাবার ঘোড়া দাবড়ানোর চাবুকটা আমারই পিঠে প্রায় ভাঙ্গে।'

এ গল্প বলার সময়েও আকাশের অন্ধকারে সামান্য কিছু তারা লাগানো ছিল। অনিল সেদিন কোন বাধা দেয়নি। 'সেই

মেয়েটিকে আমি আর কোনদিন দেখিনি নিবারণ। রোজ পথ চেয়ে থাকতাম—যদি স্কুলের পথে একবারও চোখে পড়ে। কি তেজ, কি নরম, কি সরল, কি কঠিন। কত খুঁজেছি। এস ডি ও যেদিন বদলি হয়ে যায়—' মালপত্র বোঝাই ঘোড়ার গাড়ির জানলায় মুখটা দেখতে পেয়েছিলাম। আনমনে কি যেন ভাবছিল। আমায় দেখতে পায়নি। পেলেও চিনত না। আজও মনে হয় চাবুকের দাগ আমার পিঠে বসে আছে নিবারণ। ভাবলে অবাক লাগে মেয়েটির যা বয়স ছিল—আমার বড় ছেলে এখন সে-বয়স পার হয়ে গেছে—'

এই ঘটনাই অনিল দত্তর অন্যতম কৈশোর স্মৃতি। এরকম এবং আরও সব অন্যান্য পুরনো কাহিনী বলার সময় অনিল ভীষণ একা হয়ে যেত। তখন পারলে নিবারণ এই মানুষটির সব গ্লানি, অল্প বয়সের দীনতা মুছে দিত।

'জানো নিবারণ আজকের যে অনিল দত্তকে দেখছো—সে কিছু তোতলা ছিল, লাজুক ছিল, হাওড়ায় এক এঁদো কারখানায় প্রথম ঢালাই করে সারারাত একা একা কিউপোলা ফারনেসের চিমনির সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমরা থাকতাম এক বড়লোক আত্মীয়ের বার-বারান্দায়। মানে সেখানে দু'বেলা রাঁধতে হত। একদিন শীতকালের ভোরে নীল র‍্যাপারের ভেতর মায়ের চুড়ি ঢেকে নিয়ে স্যাকরার দোকানে বাঁধা দিতে গিয়েছিলাম—'

নিবারণ জানে এমন তো অনেকেরই হয়। এর মধ্যে আর নতুন কি আছে। তবু তার মনে হয়, অনিলদা এই সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কি কষ্টটাই না পেয়েছে। এখন ম্যাঙ্গো লেনের অফিসে তার কুলার বসানো সেপারেট কিউবিকেলে ঘুম পেলে অনিলদার জন্যে ফ্ল্যাট চেয়ার আছে, মন ভালো রাখতে মাথার পেছনেই মডার্ন আর্টিস্টের আঁকা একখানা ক্যানভাস লটকানো রয়েছে। তবু এখনও অনিল দত্তর মন খারাপ হয়। অনিল-বৌদিই

বলেছে, 'কতদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি—আপনার দাদা বিছানায় যোগাসন করে বসে—'

রেবার সঙ্গে নিবারণের বিয়ের সময় অনিল বলেছিল, 'তোমার বৌদিকে আমি প্রথম দেখি এক আত্মীয় বাড়িতে। ডল পুতুলটির মত বিকেলের দিকে ফাঁকা ঘরে বসে ছিল। প্লেটে মিষ্টি। একটাও মাছি নেই যে বসবে তাতে। আমি সিধে গিয়ে একখানা সন্দেশ ভেঙে ওর মুখে তুলে দিয়েছিলাম। সন্দেশ ভর্তি মুখে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'

নিজের তিনখানি ফটো অনিলের ভারি প্রিয়। নিবারণ জানে।

শোয়ার ঘরের দেওয়ালে টানানো ছবিতে অনিল মাইকে বক্তৃতা দিচ্ছে। ইণ্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অব মেটালারজির অ্যানুয়াল সেসানে খনিজ লোহা বিভাজন সম্পর্কে একটা পেপার পড়েছিল অনিল দত্ত। নিবারণ ছিল সেখানে। অরগানিক গ্রুপের কারবন স্ট্রাকচার ফরমুলা সমেত অনিলের মুখ দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে আসছিল। যাকে বলে ফুল থ্রোটেড্ ডেলিভারি। লোকটা যেন রোজ সকালে বালতি বালতি কেমিকাল ফরমুলা দিয়েই চান করে।

ছবিটা ভাল উঠেছে। সার্টের কলারের বাইরে একজন সফল লোকের ঘাড় ভালো ম্যাটারে ঠাসা একটি মাথা ধরে আছে। বড় বড় চোখ খানিক স্বপ্নালু। অনিল ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রায়ই সস্নেহে কয়েক বছর আগের অনিলকে ছবিতে দেখে। আরেকটু কাত হয়ে দাঁড়ালে নাকের ফুটো কিছু ছোট আসত ছবিতে।

আরেকখানা ছবিতে অনিলদা ড্রেসিংগাউন গায়ে ইজিচেয়ারে লপেটা হয়ে শুয়ে। এই ছবির ব্রাইট পয়েন্ট সেই ভুবনমোহন গোঁফ। ভাবখানা—আমি দরবারে বসেছি—এবার গ্রহ নক্ষত্র হাজির হতে পার। তবে গোলমাল কোরো না যেন।

তৃতীয় ও সর্বশেষ ছবি এক আর্টিস্টের আঁকা অনিল দত্তর পোর্ট্রেট। সেখানে নাক মুখ চোখ একেবারে মিলিয়ে মিলিয়ে নিখুঁত নয়। তবু. এই ছবিখানাই আসল অনিলকে ধরেছে। চোখের ভেতর একটা শিরা ব্যথা পেয়ে যেন কিছু বেশি নীল। অনেক ধোঁয়া ঠেলে অনিল বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'আমি কলকাতায় নেমেই ঠিক করেছিলাম—আমাকে তোতলামি কাটিয়ে তুখোড় হয়ে উঠতে হবে। সব দিক ঝকঝক করবে আমার। সেই অভ্যেসে আজও নিবারণ আমি তুখোড় হয়ে চলেছি। কথায়-বার্তায় কাজে আমি শান-দেওয়া ছুরির ফলা। আজ দেখছি, সে ছুরি রক্ত অব্দি পৌঁছয় না—গভীরে পৌঁছনোর পক্ষে শর্ট।'

গ্যাসপিট থেকে গ্যাস আসছিল। রাবেল কয়লায় অন্যকিছুর মিশেল ছিল। তাই টেম্পারেচার উঠতে দেরি হচ্ছে। এক শিফ্‌টের ঢালাই বরবাদ হয়ে গেল। ওভারহেড্‌ চার্জ ধরে প্রায় বিশ হাজার টাকা লস। ম্যাঙ্গো লেন থেকে অনিলের সঙ্গে নিবারণও কারখানায় ছুটলো।

গ্যাস অ্যানালিসিসের চার্ট নিয়ে এল লতা।

খানিক পরে দেখা গেল, ভেটার্ন অনিল দত্ত অ্যানালিসিস চার্ট নিয়ে প্রায় খেলা করছে। ফারনেস বেডে দাঁড়িয়ে লতা অফিসিয়াল জবাব দিচ্ছে। অনিলের প্রশ্নগুলো সরস আলোচনায় কান ঘেঁষে যাচ্ছে।

বলা ভাল, লতা যুবতী হয়ে ওঠার শুরু থেকেই নিবারণরা ওকে আর মাখনকে চেনে। কাজ-পাগল অনিলকে এই প্রথম ঢিলে দিতে দেখল নিবারণ। হঠাৎ নিবারণকে দাবড়ে উঠল অনিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন? যাও না ফারনেস ট্যাপ করে ভেতরের মাল সব বের করে দাও।'

একাজ আর নিবারণের করার কথা নয়।

তবু নিবারণ গেল। অ্যাসিটিলিন ফ্লেম, আগুনে পোড়ানো রড আর দু'জন হেল্পার নিয়ে নিবারণ ফারনেসের পেছনে গেল। বন্ধ নালী ফ্লেম দিয়ে পুড়িয়ে ফুটো করে, রড্ দিয়ে খুচিয়ে সল করে দিতেই হড় হড় করে অনেকটা ইস্পাত লাল ফুলকি তুলে বেরিয়ে এল।

হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে অনিল কণ্ডাক্টেড্ টুরের গাইডের কায়দায় এই বিপদের মাঝখানে বেশ হাল্কা মেজাজে লতাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফারনেস বোঝাচ্ছে।

॥ ৬ ॥

সুশীলের অফিস ছুটি হয়ে যায় বিকেল হতেই। বিমানের কোন অফিস নেই। আগে চাকরির অ্যাপলিকেশন করত। আজকাল আর করে না। যে কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ে মোটাগলায় আলোচনা করে। বয়েস হয়ে যাচ্ছে বলে মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করে। গ্র্যাণ্ড ইত্যাদি কয়েকটি কথা ওর প্রতি সেণ্টেন্সের শেষে থাকবেই। অমরেশ ফুটবল-ক্রিকেটের খুটিনাটি জানে বলে যে কোন তর্কেই একটা রাইটিয়াসনেসের ঝোঁক দিয়ে চোয়াল চেপে কথা বলে। ও আগে থেকেই টের পায় কখন ওর নিজের গম্ভীর হওয়া দরকার—রেগে যাওয়া মানানসই হবে। হাফজান্তা, ঘষা-মালে অমরেশের চারদিক বোঝাই। তাদের কাছে ওর স্রেফ গাড়োয়ানি রূঢ়তা জবর পার্সোনালিটি বলে সব সময় পাচার হয়ে যাচ্ছে। তিনজনকে একই সঙ্গে পেয়ে গেল নিবারণ। ট্যাকসির সৌজন্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। টেলিফোনে ডাকলেই ট্যাকসি পাওয়া যায় কিনা যাচাইয়ের জন্য সেণ্ট্রাল এভিনুর ওপর এক পেট্রল পাম্পের বুথ থেকে ফোন করে সাত সাতখানা ট্যাকসি এনেছে পর পর। ট্যাকসিগুলো এসে দাঁড়িয়েছে—ড্রাইভাররা বাইরে দাঁড়িয়ে সওয়ারি ভেবে পথ-চলতি লোক থামিয়ে বোকা বনে যাচ্ছে। তিনফুট বাই পাঁচফুট বুথের ভেতর ঠাসাঠাসি অবস্থায় বিমান চেচাচ্ছে—'গ্র্যাণ্ড মাইরি! গ্র্যাণ্ড! দুনিয়াটা ভদ্রলোক হয়ে গেল—অ্যাঁ? পানচুয়াল হয়ে গেল!'

এমন সময় নিবারণকে যেতে দেখে তিনজনই একসঙ্গে বেরিয়ে এসে পাকড়াও করল।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কোথাও না।'

'এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিস ?'

'স্রেফ এমনি।' তারপর নিবারণ যা করল, তা হল, পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়ে পাট পাট করে রেখে গলবস্ত্র পোজে বলল, 'আমার সঙ্গে মিশবে তোমরা ? আজ ? এখন ?'

সুশীল ভদ্র লজ্জায় কুঁকড়ে যাবার দাখিল, 'এই নিবারণ কি হচ্ছে ?'

'না মাইরি। সত্যি বলছি। আমার কোন যাবার জায়গা নেই।'

'কেন বউ ছেলে কোথায় ?'

'আছে। কিন্তু রোজ ভাল লাগে বল ? সেই একই বউ—একই টেবিলে খেতে বসা—একই নুনদানি থেকে একই গ্যাটাপারচারের চামচে নুন গ্রহণ !'

সুশীল আরও কি জানতে চাইছিল। বিমান তাকে থামিয়ে জানতে চাইল, 'টাকা আছে সঙ্গে—'

'আছে।'

'কত ?'

'সে খোঁজে তোমার দরকার কি ? যেতে চাও তো চল।'

অমরেশের প্রেসটিজে লাগছিল, 'আমি কিছু দেব'খন।'

নিবারণ বেকে দাঁড়াল, 'তা কেন ? আমার সঙ্গে সবাই যাচ্ছ। আমার তো মেশামিশির ফি দেওয়া উচিত—'

সুশীল নিবারণকে থামাতে গেল, 'আবার বাঁদরামি হচ্ছে। মেরে ফেলব কিন্তু নিবারণ।'

'তুই আমাকে কোনদিন মারতে পারবি না। তোর হাতই উঠবে না।'

বিমান খুব স্মার্ট হতে গিয়ে নিবারণের পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'কেন মানিক !'

ওইভাবে কথা বলার মধ্যে অসভ্যতা বোঝাই ছিল বলেই সবাই খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না। সুশীল দোকানে ঢুকেও কথা

বলতে পারছিল না। অমরেশ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কপালে ভাজ পড়ছে দেখে নিবারণ ওর দিকে তাকিয়ে উইস করল। এমনিতে অমরেশ ফূর্তিবাজ। নিবারণের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

বিমান কিন্তু অচঞ্চল। বেয়ারাদের ঠাণ্ডা সোডা দিতে বলল। একটা লোক দূরের চেয়ারে বসে শচীন দেবের কি একটা গান গাইছিল। তাকে দেখিয়ে বিমান সুশীলকে বলল, 'গোষ্ঠবাবু সেই কাফি রাগেই গাইছে দেখেছিস। গালুটিতে ওর গলা কিন্তু আরও ভরাট ছিল। আমরা তখন বাস থেকে নেমে ছুটছি—লোকটা একটা টিলার ওপর বসে গলা ছেড়ে গাইছিল। শীতকাল—'

অমরেশ পুরনো কথায় হেসে ফেলল। তখুনি ওরা তিনজন—গালুটির ঘোষ লজের টিউবয়েল পাম্প করা এবং রাতে মশারি চুরির কথা বলতে বলতে তাতেই ডুবে গেল। নিবারণ একটুও ডিস্টার্ব না করে যখনই কোন হাসির জায়গা আসছিল—তখনই ওদের চেয়েও প্রবল বেগে হেসে দিচ্ছিল।

'এই তুই নিচ্ছিস না?'

'আমার না হলেও চলে সুশীল—'

'ন্যাকামি রাখো।' বলে বোতলটা কাৎ করে ঢগ্ ঢগ্ করে গ্লাসের খানিক জায়গা হলদে করে দিল।

বিমান বলল, 'রেখে দে পরে আমি নিয়ে নোব।'

এ কথায় অমরেশের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। নিবারণ আন্দাজ করল, এখুনি অমরেশ ধা করে বিমানকে লাথি কষিয়ে দিতে পারে। উঃ! তখন যে কি হয়ে যাবে। বিমানের মুখের দিকে তাকানোই যাবে না। তাই যে কোন অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীর ধারায় প্রায় লতানো নিবারণ অমরেশকে বলল, 'আচ্ছা একথা কি সত্যি—ব্রাডম্যান নাকি বলেছিলেন—আমি যদি মুস্তাকের মত চোখ পেতাম— তাহলে আরও অনেক সেঞ্চুরি করতাম।'

অমরেশ ঘুরে তাকাল নিবারণের দিকে, চোখ ছোট হয়ে এসেছে,

নাকের নীচে নাকেরই ছায়া পড়ে একটা বদখদ গোঁফের আভাস অমরেশকে মূর্তিমান রগচটা লোকের স্যাম্পেল করে ফেলল, 'তুমি শালা এই যৌবনে এমন বি সি কেন? মারব এক লাথ্।'

'কাকে বলছ অমরেশ? তুমি আমাকে বলছ? আমি নিবারণ—'

'হ্যাঁ নিবারণ বি সি। তোমাকেই বলছি। তোমার এত তোয়াজ করার দরকার কি?'

'তোমার নেশা হয়ে গেছে অমরেশ। তাই তুমি আমার প্রতি সুবিচার করছ না অমরেশ। নেশা কাটলে এসব কথা চিন্তা করে দেখো তোমার লজ্জা হবে—'

'কচু হবে শালা। আমি তোমার মুখে পেচ্ছাব করি—তোমার মুখের প্রতি (!) পেচ্ছাব করি—'

আজকের বিকেলে তামা মেশানো ছিল। নয়ত অমরেশের সঙ্গে সঙ্গে বিমান, সুশালও কেন এত অল্পে আউট হয়ে যাবে। অমরেশ, নিবারণকে তর্ক করতে দিয়ে দুজনে একসঙ্গে পেছনের দিকে হাত ঘুরিয়ে হাওয়া কাটছে। বিমান সুশালকে বোঝাচ্ছে, প্লেনের প্রপেলার কোন্‌দিকে ঘুরে স্টার্ট নেয়। সুশীল বলল, 'উহু ওদিক থেকে নয়—ঠিক বাঁদিক থেকে পাক খেয়ে প্রপেলার স্টার্ট নেয় এইভাবে—' সুশীল হাত ঘোরালো। টেবিলের ওপর থেকে একটা সোডার বোতল, দু'টো ফাঁকা গ্লাস প্রপেলারে বেধে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। একদম ফিনিস। বেয়ারা ছুটে এল।

বিমান বলল, 'নাথিং। ক্যারি অন—'

অমরেশ নিবারণকে বলল, 'আমি তোমার মুখে একশোবার পেচ্ছাব করি। পেচ্ছাব করি তোর ম্যাঙ্গো লেনে। তোর অনিল দত্তর মুখে। অত ইয়ে করিস কেন লোকটাকে? অত ভক্তি কিসের?'

'তুমি বুঝবে না অমরেশ। তোমার বেসিকে গণ্ডগোল আছে

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা বোঝার মত প্রপার বয়স এখনও তুমি পাওনি।'

'তুমি পেয়েছ শালা। তাইতো দত্ত সাহেবের থুথু চেটে বেড়াও।'

নিবারণ বুঝলো এখন অমরেশের সঙ্গে তর্কে যেয়ে কোন লাভ নেই। আমি যে অনিলদাকে আজ কতদিন জানি—তার ও কি জানে। আমি জানি নাইনটিন ফিফটি নাইনে অনিলদার গোড়ালি কেমন ছিল। সিক্সটি ওয়ানে নিজেকে ভীষণ ভালবেসে ফেলে নিজেই নিজের চুল ছাঁটতো ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে।

একদিন অনিলদাকে সুন্দর বলাতে, অনিলদা বলেছিল, 'কেন লেগপুল করছ নিবারণ।' তখন অনিলদা কালো গগলস্ পরেছিল।

ঝন্‌ঝন্ করে শব্দ হল। টেবিল ফাঁকা। সুশীল দু'হাতে এমন জোরে প্রপেলার ঘুরিয়েছে। মেঝেতে কাচের ছড়াছড়ি। এখুনি সুশীলের কাছে যাওয়া দরকার। ও নীচে হুমড়ি খেয়ে বসে ভাঙা গ্লাস জোড়া লাগানোর অ্যাটেমপ্ট করছে, 'চিন্তা নেই। এখুনি হয়ে যাবে—'

অদ্ভুত অবস্থা। টেবিল ছেড়ে নীচে যাচ্ছিল নিবারণ।

অমরেশ টেনে ধরল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

নিবারণ ফিরে বসল।

'আমরা যৌবনে সিংহের মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। তবে ছেলেমেয়েকে খাইয়েছি। কোনদিন জুটেছে—কোনদিন জোটেনি।'

অমরেশ বিয়ে করেনি। নিবারণ বুঝলো, সিঁথির দিকে আজকাল যেখানে যাত্রার রিহার্সাল দেয়—সেখান থেকেই ডায়ালগটা পেয়েছে। কোন আপত্তি করল না নিবারণ। সুশীলের হাত কেটে রক্ত পড়ছে। বিমানের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাঙা গ্লাস কুড়িয়ে নিয়ে তাতে গড়ানো বোতলের সোডা ঢেলে দিল, 'এই ব্যায়রা—।'

শোনালো ঠিক—অ্যাই ব্যায়লা।

'আর তুমি শালা ইঁদুরের মুখ থেকে খাবার খুবলে খাও। কি দরকার তোমার? নিজেকে ম্যাঙ্গো লেনে বিকিয়ে দিয়ে তোমার কি প্রফিট? এই অমরেশ পালের দিকে তাকাও—'

আর তাকাতে হল না। কাউন্টার থেকে দু'টো ষণ্ডা মার্কা লোক বেরিয়ে এসে সুশালকে দু'হাতে কাউন্টারের কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল। ওর স্যাণ্ডেল খুলে গেল। নিবারণ দৌড়ে তুলে নিতে গেল। পেল না। অন্য কেবিনের একজন মাতাল পুরো ব্যাপারটাই একটা লুকোচুরি খেলার গোলমাল ভেবে দু'পাটিই তুলে নিল। তখন সুশালের দু'টো হাতই কাচে কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। একরকম চোখ বুজেই নিবারণ পুরো বিল পরিষ্কার করে দিল।

অমরেশের কথায় নিবারণের ভেতরটা থেতলে গেল। কিন্তু এখন কিছু করার সময় নেই। বলারও না। তখনই অমরেশ বলল, 'তুই ভীষণ নোংড়া—ভীষণ—'

সুশালকে ওরা বাইরের ফুটপাথে এনে ফেলে দিল। সুশীল তখন কি মনে পড়েছে—ব্যাপারটা বোধহয় কোন দুঃখের হবে—ভীষণ জোরে কেঁদে উঠতে চাইছে। পাবলিক জুটে গেল। অমরেশের গলা শোনা যাচ্ছে, 'ভীষণ—ভীষোণ—বিষণ—'

নিবারণ যতবার ওর দু'বগলের নীচে হাত গলিয়ে সুশীলকে টেনে তুলতে চায়—ততবারই ও শ্লিপ করে ফুটপাথে পড়ে যায়। রাস্তায় কত ধুলো। কাটা জায়গায় লেগে টিটেনাস না হয়। আজ অমরেশ আমাকে এ সব কি বলল। আমি তো এর কোনটার জন্যেই দায়ী নই। অমরেশ, বিমান দূরে ট্যাকসি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে শ্যামবাজার অব্দি শেয়ারের প্যাসেঞ্জার খুঁজছে। এই বিপদের মাঝখানে পড়েও নিবারণ বুঝলো আসলে বিমানই খুঁজছে—অমরেশ অনলুকার। শেয়ার খুঁজতে প্রেসটিজে আটকায়—কিন্তু শেয়ারের প্যাসেঞ্জারের পাশে বসে ফুক ফুক সিগারেট টানতে আটকায় না অমরেশের।

কোন ট্যাকসি সুশীলকে নিতে চায় না।

একজন রাজী হল। তবে ভাড়া অ্যাডভান্স দিতে হবে। আর নিবারণ গ্যারান্টি দিল, 'আমরা কেউ গাড়ির ভেতর বমি করব না স্যার —কথা দিচ্ছি। এটা সন্ধ্যেবেলার কথা স্যার—'

সুশীল কিছুতেই ভেতরে বসবে না। লক্ষ্মী ছেলে, ভাই সুশীল, আমি আউট হয়ে গেলে কতদিন তুই আমায় আদর করেছিস আয় আজ তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। আয় ভালবাসি তোকে। কতকাল আমাদের মেশামিশি হয় না। আচ্ছা তুই যে এত ভদ্রলোক —এটা কি তোর ইনহেরেন্ট ব্যাপার? রক্তে আছে? আচ্ছা সুশীল তুই বলতে পারিস, অমরেশ আজ আমায় এসব কথা বলল কেন?

ট্যাকসিতে বসতেই দেখল, পুলিশের কালো ভ্যান এসে গেল। একজন স্বাস্থ্যবান অফিসার নেমে এসে গাড়ি ছাড়তে বারণ করল। ভিড়ে ভিড়াক্কার।

কাছেই থানা ট্যাকসি ছেড়ে দিয়ে ওদের ভ্যানে উঠতে হল। অফিসার খাতায় কেন লিখল, 'ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড এসকরট্ নিবারণ পাকড়াশি ওয়াজ ইন হিজ সেনসেস্।' দু'জনে সই করল। হেড জমাদারের ডেকে দেওয়া ট্যাকসিতে সোজা সুশীলের বাড়ি।

সেদিনই বেশি রাতে খেতে বসে রেবাকে সব বলল নিবারণ, 'আমি বুঝে উঠতে পারছি না—কেন অমরেশ ওরকম বলল।' রেবার সামনে ঠিক এতটাই বিভ্রান্ত নিবারণ তার মনের মধ্যে যে-কষ্ট হচ্ছিল—তার সামান্যই ওই ক'টা কথায় ওপরে তুলে আনতে পারল। আসলে ভেতরের কতটাই বা বাইরে এনে নেড়েচেড়ে দেখা যায়।

'তুমি তবু সেধে যাও কেন?'

কিছু না বলে নিবারণ খাওয়া শেষ করল। রাতে শুয়ে বুঝতে পারল, তার যা-কিছু লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উদ্যম ছিল—তা থাকলেও তার ভেতরে এমন কোন বিশেষ দিকে এগোবার মত কোন চাড় নেই।

ফলে সে নানান সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য-সম্পদ-বয়স থাকা সত্ত্বেও অনেক-গুলো উল্টো টানের টানাপোড়েনে একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন রাতে কলকাতার কয়েকটি গলিপথে কিছু জ্যোৎস্না নেমে এল। বন্ধ দোকানঘরগুলোর ভেতরে দেওয়াল ঘড়িতে দু'টো বাজল।

নিবারণ পাকড়াশি সম্পূর্ণ ভিন্ন মহাদেশে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন সময়ে গিয়ে হাজির হল।

ইউরোপ। হিটলারের নিভৃত শৈলাবাস। আল্পসের নীল চূড়ো খাওয়ার টেবিলে বসে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে-টেবিলে খেতে বসেছে—তার যে কোথায় শুরু কোথায় শেষ বোঝা যাচ্ছে না। লম্বা. চকচকে টেবিলের দু'ধারে বড় বড় জেনারেল, ফিল্ড মারশাল, কয়েকজন যুদ্ধবন্দী সেনাপতিও আছেন—আর আছেন গোয়েরিং—কোমরের বেল্ট উপচে ভুরি ঝুলে পড়েছে।

টেবিলের মাঝখানে হিটলার। তার একপাশে গোয়েবলস্—অন্যপাশে নিবারণ। আজ সে অবাক হয়ে গেল—তার নিজের পরনেও আর্মির ইউনিফর্ম। পায়ে ভালো বুট। একটু দেরিতেই লাঞ্চ বসেছে। সামান্য রোদে বাগানের অর্ডিনারি ফুল, লতাপাতা খুব মনোহারী দেখাচ্ছে।

টেবিলের দু'ধার দিয়ে দু'জন মিলিটারি পুলিশ মটোর সাইকেলে সাঁ সাঁ করে পরিবেশন করে যাচ্ছে। সুপের সময় অবশ্য অন্যরকম হল। মাইলখানেক লম্বা টেবিলে বসে নিবারণ জারমান মিলিটারির বড়াখানা খেতে লাগল। শেষে পায়েস দিল। তখনই জেনারেলরা—মায় রোমেল পর্যন্ত শুধু হাতে খুব সাপটে চেটে চেটে পায়েস খেতে লাগল।

হিটলারের উরুতে বড় এক ফোটা পায়েস পড়তেই চেয়ারের পেছন থেকে ওর ভ্যালেট হাত এগিয়ে দিয়ে আঙুলে মুছে নিল। সঙ্গে সঙ্গে হিটলার উঠে দাঁড়িয়ে সরল সংস্কৃতে জারমান সামরিক বিজ্ঞানের নতুন সাফল্যের কথা ঘোষণা করল। ফুলপ্যাণ্ট পরে

হিটলার এত ভাল সংস্কৃত বলে। নিবারণদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই ইন্দিভূষণ মল্লিক—সর্টে আই বি এম এই দৃশ্য দেখলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেত। নিবারণ নিজেও ম্যাট্রিকে সাতান্ন পেয়েছিল স্যান্সক্রিটে।

'অয়ম্ আরম্ভ—' বলে হিটলার শুরু করেছিল। 'আত্মানং বিদ্ধি' বলে শেষ করল। মোদ্দা কথা যা বলল, তা হল, মানুষের সোল বা আত্মা—নীল রংয়ের। তা সবসময় আমাদের বুকের ভেতর থেকে বাইরে আলো পাঠাচ্ছে। জিনিসটা তরল পদার্থে ভাসে।

নিবারণ বুঝতে পারল না—এই আবিষ্কার সামরিক অভিযানে কোন্ কাজে লাগবে।

হিটলার একটু আগে বলেছে—সাবহিউম্যান ইহুদিদের সোল বুক থেকে সাবধানে কুরে তুলে নিয়ে স্যালিস্যালিক অ্যাসিডে ফেলে দিয়ে দেখা গেছে বয়মের ভেতরটা নীলচে আলোয় আস্তে আস্তে ভরে যায়।

'দু'জন সোলজার অ্যাসিড্-ভর্তি একটা বিরাট বয়ম ধরাধরি করে এনে টেবিলে রাখল।

হিটলার নিবারণকে বলল, 'পশ্য ?'

স্যালিস্যালিক অ্যাসিডে তিনটি ইহুদি আত্মা বয়মের ভেতরে ময়রার মাখনের ডেলার কায়দায় ভাসছে। বয়মের ঢাকনা তুলে গোয়েরিং জন্মদিনের মোমবাতি নেভানোর স্টাইলে ফু দিল। একটা আত্মা ভাসতে ভাসতে বয়মের কাচের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পিছলে গেল। আর দুটো জোড়া লেগে এমন ডবল জোরে নীল আলো ছড়িয়ে দিল যে, গোয়েরিংয়ের মুখখানায় কে এইমাত্র ছোট এক কৌটো রবিন ব্লু ছড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হল। সেই আলোর ভেতরে গোয়েরিং হাসছিল।

আত্মা দু'টি তখনও গভীর সখ্যতায় জোট বেঁধে আছে। একেবারে মেশামিশি করে ভাসছে। মাঝখানে অন্য কারও হাড়,

মাংস—কোনরকম অবয়বের ব্যারিকেড নেই। এই দু'ডেলা ভাসমান নীলাভ মাখনের মালিকরা কে কেমন ছিল—এখন তা আর স্মৃতিতেও জায়গা পাবে না।

হিটলারের সামনে নিবারণের অন্য কোন সংস্কৃত কথা মনে পড়ল না।

তাই নিরুপায় হয়ে একটা খুব সরল স্যান্সক্রিট বলল, 'হা হতোস্মি!'

ততক্ষণে সেই পাহাড়ি বাংলোবাড়িতে আলো মরে গিয়ে অন্ধকার পড়ে গেছে। শুধু বয়মের ভেতরকার নীলচে আলো ছড়িয়ে পড়ে ফিল্ড মারশাল ভন পলাসের বুকে খাঁটি তামার জারমান স্বস্তিক চিকচিক করে তুলল।

রেবার বুকের সরষের তেলের গন্ধে নিবারণের ঘুম ভেঙে গেল। পৃথিবীতে সবচেয়ে ওই জায়গাটাই তার নরম লাগে। চামড়া ভাল থাকবে বলে রেবা ঘানির খাঁটি তেল মাখে। জানালায় একফালি জ্যোৎস্না। তখনও হিটলারের শেষ কথাটা নিবারণের কানে বেজে যাচ্ছিল—'ভো ভো পাকড়াশি—'

খড়খড়ে দাড়ির খোঁচায় রেবার ঘুম ভেঙে গেল। একটি জানাশুনো মাথা বুকের ওপর পেয়ে ডানহাতে তা চেপে ধরল—চোখ আবার বুজে গেল।

নিবারণের ডাকাডাকিতে অনেককষ্টে চোখ খুলল রেবা, 'কি?'

'আত্মায় ফসফরাস থাকে?'

আপনাআপনিই চোখ বুজে গেল রেবার, 'থাকে—'

'নইলে অমন আলো দেয় কেমন করে?'

॥ ৭ ॥

মাথার কাছে চা ঠেকিয়ে দিয়ে ভোরে রেবা ঘুম ভাঙালো।

নিবারণ চাইছিল, চৈত্রমাসের বিকেলে ফুরফুরে হাওয়ায় সে যদি বড় একটা দীঘিতে সাঁতরাতে পারত! সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীল আলোর পাঁপড়ি মেলে অনেকগুলো আত্মা ভেসে বেড়াত সেই দীঘিতে। তাদের পাশ দিয়ে নিবারণ চিৎ সাঁতার দিয়ে যেত। একটা দু'টো নীল পাঁপড়ি কি আর বুকে এসে না পড়ত।

তার বদলে রেবার সঙ্গে বসে বসে চা খেল। গোলাপি সায়ার ফালি, গোঁফের আভাস, সস্তার ব্লাউজে বোঝাই যায়—ইদানীংকার তুলনায় রেবা একজন রীতিমত স্তনাঢ্য রমণী।

'তুমি অমন করে জড়িয়ে পড়েছিলে সারারাত—আমার ঘাড়ে খুব ব্যথা হয়েছে।'

'বুকে হয়নি?'

রেবা চোখ দিয়ে নিবারণকে বকল। 'তাও হয়েছে।'

'কোন্‌খানটায়?'

ছেলে তখনও ঘুমে।

'এখানে—', রেবা নিজের বুকের একজায়গায় আঙুল রাখল।

সেখানে নিবারণ ডান হাতের বুড়ো আঙুল টিপছাপ দেওয়ার কায়দায় চেপে ধরতেই রেবা চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ! লাগে না? সরো—'

বউ একেবারে নিজের জিনিস। সে যদি এভাবে বলে—তবে কেমন লাগে। নিবারণ রেবাকে নানা প্রকারে জানে। যেমন, জ্বর হলে ও একদম কথা বলে না। শুধু নুন-মাখানো লেবু খাবে। এইমাত্র বুড়ো আঙুলে একটু চাপ দিতেই রেবার বুকের ভেতরটায়

একখানা পাতলা পিচবোর্ড মার্কা হাড় তুবড়ে যাচ্ছিল। তার ওপিঠেই হার্ট থাকে। কাল রাতে—অব অল পার্সনস্ হিটলারই দেখালো, হার্ট বা সোল জলে ভাসে, নীল আলো দেয়। কোন অবয়বের ভেতরে না-থাকলে তারা কেমনে মিশে যায়।

রেবা কাপ উপুড় করে তলানি চিনিটুকু খাচ্ছে। মাথা, বেণী পেছনে ঢলে পড়ল। পাহাড়তলীর যে কোন গাঁয়ে ভোর ভোর বক নেমে পড়ে এমনি করে মাথাটা পেছনে ফেলে সরু ঠোঁটে বুনোপোকা তোল্লা করে খায়। তখন ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা জ্যান্ত ঝর্ণা থাকলে দারুণ সিন। ফেনাভর্তি ঝর্ণা ক্রমাগত জল ঢেলে ঢেলে একটি স্থিরচিত্র বই কিছু নয়। পলকা বুকটুকু তুলে ধরে বকটা একটা শাদা সরল রেখা মাত্র।

এখনই রেবার বুকে হাড়ের কলমটা বসিয়ে দিতে পারলে নীল আলো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। গোটা গোটা হাত পা, মুখমণ্ডল, ধড় এসব থাকতে যতই কাছে টানা যাক্—নিবারণ দেখেছে—সেখানে পৌঁছতে এসবই দারুণ বাঁধা।

কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্যে রেবারই ব্যবস্থা মত রোজ ভোরে নিবারণকে বড় একগ্লাস বাসি জল খেতে হয়। সেই জলের সম্মানে তদনুযায়ী কাজকর্ম সারতে হয় নিবারণের। বাথরুমে ঢোকে খবরের কাগজ বগলে। গালে সাবানের ফেনা মাখিয়েই টিফিনবক্সে ছানা কম করে দিতে বলে রেবাকে। এইভাবে নিয়মে ঠাসা একটি জীবন চলে।

রেল ব্রিজের তিনটি গার্ডার ঢালাই হবে। সকাল থেকে অনিলদা ফারনেসে। নিবারণ গিয়ে যখন পৌঁছালো—তখন লতা একবার ফারনেস বেড একবার ল্যাবে ছোটাছুটি করছে। হাতে স্যাম্পেল বোঝাই টিউব। ইস্পাতের পুরনো পোকাটি এককোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট বাগিয়ে গাঁজার টান দিচ্ছিল।

নিবারণ জানে, এখন অনিল দত্তকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা

ডেনজারাস্। অথচ এত বড় একটা কর্মকাণ্ডে কি করেই বা এলেবেলে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। লতা একটা স্যাম্পেল চার্ট এনে অনিলের সামনে ধরে দাঁড়াল। অনিল ফারনেস গ্লাস তুলে আগুনের চেহারার আন্দাজ নিল। লতা আবার ল্যাবে ফিরে যাচ্ছিল।

নিবারণ খুব মন দিয়ে লতার চলন্ত পাছা দেখতে লাগল। কোমরে সেই পরিমাণই মাংস—যাতে ব্লাউজের বাইরে ফালি-পরিমাণ শরীর শাড়ি আর জামার কনট্রাস্টের মাঝখানে একটা ডিজাইন হয়ে থাকে।

লতার মুখ এখন আগেকার মত আর নেই।

একবার মুখোমুখি হতেই লতা নিবারণকে উইস করল। গলার পাথরের ডুমো মালা এখন ওর বুকের ওপর অ্যাডেড্ অ্যাট্রাকসন। পিঠ বেশ কিছুটা আদুড় রেখে টেনে চুল বেঁধেছে। এটা আর যাই হোক ওয়ারকিং গার্লের ড্রেস নয়।

সন্ধ্যের দিকে ঢালাইয়ের পর অনিল দত্তর গাড়িতে নিবারণ বসল। গাড়ি ছাড়ার আগে লতাও এসে উঠল। ওর কানে পাথরের ঝুমকো। এতদিন এসব কোথায় তোলা ছিল। পায়ে উঁচু হিলের জুতো। তাই লতার শরীরটা অন্যরকমের খাড়াই দেখাচ্ছে।

গাড়িতে বসে নিবারণ খুব অসুবিধায় পড়ল। একজন তার অনেকদিনের চেনা। অন্যজন অফিসের ওপরঅলা।

লতা হিরোইনের ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলছে। অনিল বারো বছর আগের হিরোর স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে। সোফ্রার হলে ভাল ছিল। তা না হয়ে খাঁটি নিবারণ পাকড়াশি হয়ে নিবারণ পেছনের সিটে চুপচাপ বসে থাকল।

অফিসে পৌঁছেও নিবারণকে অনিলদার ঘরে গিয়ে বসতে হল। সেখানে তার পাশে লতাও বসল। কিছু ভাল খাবার এল। দই-মাখানো মুরগির মাংস—সরু চালের বিরিয়ানি। দি গ্রেট ন্যাশানালে ওভারটাইমের সময় এটাই রেওয়াজ। অনিল মুরগির ঠ্যাং চুষে

ছেড়ে দিচ্ছিল। লতা তা নয়। মুড়মুড় করে চিবিয়ে প্লেটের কোণে রাখছে। নিবারণের গালে ঝোল লেগে গেল। অনিলদা হাত মুছে ফেলল রুমালে, 'তুমি এবার এস—'

নিবারণের খাওয়া কিছু বাকি ছিল। সেগুলো বাতিল করে উঠে পড়ল। লতা বসবে—বোঝা গেল। কেননা, ও বলল, 'পান কোথায় ?'

বাইরে বেরিয়ে প্রথমেই মনে হল, অমরেশ কি এভাবে বলেছিল : তোমার মুখে পেচ্ছাব করি। অনিলদা এইমাত্র বলল, 'তুমি এবার এস।' কারণ পরিষ্কার। কারণ লতা। একবার ভাবল না, এভাবে একজনকে—অন্তত নিবারণকে বলা যায় না—বিশেষ করে অনিল বলে কি করে। অনিলকে নিবারণ নানাভাবে জানে। অনিল যা নয়—তার চেয়েও বড় করে দেখতে অভ্যস্ত নিবারণ। সে-দেখায় ভালবাসা আছে। অনিলের অজ্ঞাতে সে অনিলের বিপদ-আপদের উপর নজর রাখে। কিন্তু এক সেকেণ্ডে কেমন সহজে নিবারণের এসব উড়িয়ে ফেলে দিল অনিল। উপরন্তু লতার সামনেই।

কেননা, এই লতা—যাকে নিবারণ সামান্য কয়েক বছর আগে বলেছিল, পরিষ্কার বলেছিল, 'মাখন তো অনেকদিন তোমায় পেল—এখন তার আর কোন অনুযোগ থাকা উচিত নয়—'

এসপ্ল্যানেডের ভিড়ে, ঠিক অফিসভাঙার বিকেলে এসব কথা খুব ইমপার্সোনালি বলা যায়। তাই লতা বলেছিল, হাসি চাপতে চাপতে, 'অতএব এখন আমি—'

'নিশ্চই। তুমি তো কম দাওনি তাকে। এ-ব্যাপারে মাখনের কোন গ্র্যাম্বেল করা উচিত নয়। আমি তার জানাশুনো ফ্রেণ্ড। সে বুঝবে আমার থেকে তোমার কোন মারাত্মক বিপদ কোনদিনই হবে না। আমার বুকে বুক ঠেকিয়ে দেখ না একবার—আমি ভীষণ জোরে চেপে ধরতে পারি—'

তখনও লতা যৌবনের একেবারে কানাতে এসে পৌঁছয়নি।

গরমকালে একটা শাদা শাড়ির সঙ্গে লাল ব্লাউজ দিয়ে কেয়ারফ্রি অথচ ইণ্টারেস্টিং হয়ে থাকত। শীতকালে অবশ্য মাঝে মাঝে নোংরা লাগত। একদিন একটা খারাপ গন্ধ পেয়েছিল। অনেকটা পোড়া বেত ফলের—

'কি, মুশকিল নিবারণ—এত যুক্তি জান তুমি—একটা জিনিস জান না?'

নিবারণ তাকিয়ে পড়াতে লতা পরিষ্কার বলেছিল, 'আমি তোমার বন্ধু। কিন্তু বুকে বুক লাগাই কি করে। আমরা বলি—'দেখুন।' তুমি বল—'ছ্যাখেন—'

'কোন অসুবিধা থাকা উচিত নয়। আমার উচ্চারণ তোমাদের চেয়ে কিছু অন্যরকম হবেই। সেটাও আমার দিকে তোমার তাকানোর একটা অন্যতম কারণ। উপরন্তু আমি তোমার শরীরের ভেতরে সময় মত সব জাগাতে জানি—সব জাগাতে পারি—'

লতা বড় পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তাহলে তোমার একটা চেঞ্জও হবে লতা—সেজন্যে তুমি হাতের কাছে আমাকে পেলে। তোমাকে অজানা লোকের সঙ্গে কোন ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না। আমিও এই সুবাদে তোমাকে জানার একটা বড় সুযোগ পাব—'

'রেবাকে বলে দেব—'

নিবারণের বউয়ের চেয়ে লতা কিছু বড়ই হবে। উপরন্তু মাখনের হাতে অল্পবয়স থেকেই গাভিন হয়। তাই 'রেবাকে বলে দেব' বলে ফুল্ল কিশোরী হতে গিয়েও পারল না। অমনি নিবারণের চোখে মায়াজাল খানিক কেটে যায়।

যে ফারনেস কাৎ করে গলন্ত পিগ আয়রন ব্লাস্ট ফারনেস থেকে ওপেন হার্থে ঢালাঢালি করা যায়—তাও পুরনো হতে চলল। কালে কালে কত হবে। ক' বছরে রাশিয়া, ওয়েস্ট জারমানি, ব্রিটেনে ঘন ঘন যাতায়াত করে এতকালের স্বপ্ন, সম্ভ্রমের বিলেতকে রামাশ্যামাও

এপাড়া-ওপাড়া বানিয়ে দিল। এদের নিবারণ বুঝতে চায়। অনিল বুঝতে পারে না। তাই নিবারণকে উপলক্ষ করে প্রায়ই বলে 'তোমাদের জেনারেশন।'

স্টিল হাউসে সেমিনার ছিল। ইন্সটিট্যুট অব মেটালারজির ফেলো অনিল দত্ত পেপার পড়ল—'রিহিটিং অব ইনগটস্ অ্যাট্ ভার্টিক্যাল পোজিসন সেভস্ ফুয়েল।'

নিবারণ এটুকু জানে—অনিল দত্ত মাথা থেকে কাজওয়ারি রাস্তা বের করে খরচ বাঁচাতে পারে ( সেটাও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইকনোমিকসে কম কথা নয় )—কিন্তু এখন দেশে দেশে নানান ফারনেসে যেসব কাণ্ড হচ্ছে—তার তুলনায় টন প্রতি কিছু ফুয়েল সঞ্চয় কোন বড় ব্যাপার নয়।

সেমিনারে বাছা বাছা লোক এসেছিল। ছাপানো পেপার আগেভাগেই বিলি করা হয়। তবু লতা ভিড়ের মধ্যে বসে নোটস্ নিচ্ছিল। তুমি স্টুডেণ্ট নও। তুমি ফারনেস ল্যাবরেটারির অ্যানালিস্ট। তোমার কি এসব সাজে। নিবারণ পষ্ট দেখল, অনিল পড়ে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অডিটরিয়ামের প্রায় সামনের সারিতে দুটি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়েই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে—লাইন বাদ পড়ে যাওয়ার জোগাড়।

কবরীর ছাদ, উদারবক্ষ, উড়ন্ত কাজলের টান, গলায় ডুমো ডুমো কালো পাথরের মালা—লতা মাথা ঘোরাতেই দুই কানে ঝোলানো বালতি প্যাটার্নের পাথরপানা ঝুমকো জোড়া হলঘরের আলো ওর নিজের মুখমণ্ডলের চৌদিকে খানিক ঠিকরে দিল।

এই সব সময় নিবারণেরও বিভ্রম হওয়ার কথা। কিন্তু তার প্রথমেই মনে পড়ল, হয়ত ঠিক এখনই—সমস্তিপুর এক্সপ্রেসের থার্ড ক্লাস কামরায় দেহাতি প্যাসেঞ্জারদের ভিড় ঠেলে ঠেলে মাখন টিকিট পাঞ্চ করছে।

বরং তার মায়া হল অনিলের জন্যে। সে নিজে যখন একদা

লতার সঙ্গে খোলাখুলি ভালোবাসার কথা নিয়ে খুব ক্যাজুয়ালি কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কথা বলেছে তখন—খুব বেশি হলে কি হয়েছে? তাদের দু'জনেরই শরীরের ভেতরে গ্ল্যাণ্ডের থোলো থেকে আপনাআপনি রসের ক্ষরণ ঘটেছে। কিছু জ্ঞানে—কিছু অজ্ঞানে।

কিন্তু অনিল? অনিল দত্তর কি হবে। অনিলদা তুমি আমাদের আগে এসেছ। তুমি আমাদের চেন না। তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমাদের সময়ের গলিতে নেমে পড়তে পারবে না। যেমন আমি নিবারণ পাকড়াশি—এখনকার ছেলেমেয়েদের ভাষাই বুঝি না—তারা যেভাবে যে ঢঙে হাসাহাসি করে তা আমার কাছে একদম ফরেন। এতে ওদেরও দোষ নেই। আমারও কোন দোষ নেই। এই নিয়ম। দেখ না কেন—নাইন্টিন টেনে যেসব লোক এই দুনিয়াটাকে জানতো—তারা কমতে কমতে কত কমে গেছে। পৃথিবীর জানাশুনো সেই সব লোকজন একদিন আর একটাও থাকবে না।

সিলিকা প্লেটের ওপর আঠারো হাত লম্বা চামচে করে গলন্ত ইস্পাত ঢেলে দেওয়ার পর যেমন ফুলকি বেরোয়—তেমন তেমন কারবন থাকে মাইল্ড স্টিলে। চৌদ্দ পাউণ্ড হাতুড়ির ঘা দিয়ে সদ্য ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্যাম্পেল দু'টুকরো করলে ফ্র্যাকচারের দানা যেমন যেমন থাকে—তেমন তেমন ম্যাঙ্গানিজের মিশেল থাকবে ইস্পাতে। এসব কথা একদা অনিল দত্ত নিবারণ পাকড়াশিকেও হাতে ধরে ধরে শিখিয়েছিল। মুগ্ধ নয়নে লতা ইদানীং অনিলকে তাতিয়ে দিয়ে এসব শোনে আর নোট নেয়। আলাদা রেকসিনে বাঁধাই-করা খাতা বানিয়েছে মোটামত একখানা। নোট নেওয়া—অনিলের বলে যাওয়া—সবই ঘটে নিবারণের চোখের সামনে। মাঝে মাঝে অনিল অস্বস্তিতে পড়ে। তাই নিবারণকে বলে, 'তুমি এখন এস'।

দিনে দিনে লতা প্রায় কিশোরীটি হয়ে উঠল। খল খল করে হাসছে। হাতে ঢাউস বেতের ব্যাগ, হাসির তোড়ে এক একবার

ধপাস করে ওর উরুতে গিয়ে পড়ছে। নিবারণের বড় কষ্ট। এতখানি একটা সুন্দর কাণ্ডকারখানার মাঝখানে সে শুধুই লতার পাছা দেখতে পায়—দেখে সুখও পায়। নাভির কাছে বড় এক স্লাইস ননীর পারা মাংস লতার হাঁটাচলায় সলিড বরফ হয়ে আগাগোড়া নিয়ে নড়ে চড়ে। নিবারণ শুধু হসন্তি লতার আলজিভ, দাঁতের ওপিঠে এত বছরের স্বাদলাই দেখতে পায়।

বইলাডিলা খনির খনিজ লোহা সম্পর্কে রিপোরট দেওয়ার জন্য পার্লামেণ্টারি কমিটির সঙ্গে বেসরকারী সদস্য হিসাবে অনিলও উড়িষ্যায় গেল ক'দিনের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে লতাও উধাও।

অনিল ফিরতেই লতাও হাজির। যোগাযোগটা নিবারণের চোখে পড়ে গেল। অনিল ফিরবে বলেছিল সেভেন্টিস্থ। ফিরে এল টোয়েন্টিথার্ড।

কোনরকম ঢাকাঢাকি না করে লতাই মোটরে বাইরোড জার্নির থ্রিলের কথা শুরু করে দিল। রঘুনাথদা রেল স্টেশনের কাছে ফরেস্ট রেঞ্জারের বাংলোয় কত সস্তায় খাওয়া-থাকা যায় দু'জনে সেকথাও জানালো। মাখন আমার বন্ধু। লতা তুমিও আমার বন্ধু। অনিলদাও কম কিছু নয়। অনিলবৌদি একজন পারফেক্ট লেডি। তবু এসব হচ্ছে কেন। নিবারণ লতা বা অনিল কাউকেই এসব বলতে পারল না।

জগন্নাথদেবের জন্যে রোজ ভোরে পাণ্ডারা কেমনভাবে দর্পণে দাঁতনের ব্যবস্থা করে সেকথা সবিস্তারে বলে লতা কোনারকের পাথরের মূর্তিগুলো নিয়ে পড়ল। 'কি আশ্চর্য ভঙ্গী নিবারণ! কি বলব!' কিছু বলার দরকার ছিল না। লতা একখানা পা আরেক পায়ের ওপর ক্রস করে বসে পাথরের নারীমূর্তির নাচের মুদ্রা ডান হাতে এক তুড়িতে দেখিয়ে দিল।

নিবারণ লতাকে দেখছিল। গত দশ বিশ বছরে লতা রোগা ভাবটা কাটিয়ে উঠে রীতিমত ফুলেই চলেছে। বিয়ের পর পর

মাখনদের বাড়ি গিয়ে দেখেছে, লতার পায়ের আঙুলে লোহার আঙটি। পরে জেনেছে, ওসব নাকি গুণ করা। লতার নিঃশ্বাসে যাতে মাখনের কোন অকল্যাণ না-হয় সেজন্যেই ওসব।

এই লতার বুকের ভিতরে কতদূর চলে যাওয়া যায়। ও ওর বুক, পাছা, তলপেট, হাসির ছোঁয়াচ, ভাঙা খোঁপার ঢঙ এটসেটরা নিয়ে এত ব্যস্ত বলেই একটা জিনিস একদম জানে না। বুকের দু'ইঞ্চির নীচেই পাতলা একখানা পিচবোর্ড মার্কা তরুণাস্থির আড়ালে বাম অলিন্দ দক্ষিণ অলিন্দ দিনরাত ধরে রক্ত চালাচালি করে। নিবারণ লতার সামনাসামনি বসেই মনে মনে একটা সলিড অঙ্ক কষে নিল। সে যদি এখন লতার ভেতরে যেতে চায় তাহলে কি কি বাধা সামনে পড়বে? প্রথমেই কিছু জামাকাপড়—তারপর নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এসব খুঁড়ে ভেতরে পৌঁছলে একটা নীল আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায়। লতা তো এসব কিছুই জানে না। না জেনেশুনে বেশ ভালোই আছে।

দি গ্রেট ন্যাশানাল আয়রনে লতা জয়েন করার মাস দুই বাদে একদিন নিবারণের হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতেই অনিল মাখনদের বাড়ি গিয়েছিল। সেই প্রথম যাওয়া। তারপর অনিলের সড়গড় হয়ে যায়। আচমকা যেদিনই গিয়ে হাজির হয়েছে নিবারণ—দেখে অনিল ফরাসে অ্যাট ইজ বসে আছে। বরং নিবারণ যাওয়াতেই অনিল কিছু আড়ষ্ট হয়ে যেত। নিবারণেরও কম অস্বস্তি নয়।

একদিকে পুরনো বন্ধু লতা, মাখন। অন্যদিকে অনিল দত্ত। আচমকা বেশি বয়সে প্রেম এসেছে।

লতা কখন কি করে, কেন হাসে, মেয়ে বলেই আপনাআপনি ওর ভেতর থেকে কখন কপট রাগ, কটাক্ষ, অভিমান ফুটে বেরোয়—অনিলের ওপর ঝরে পড়ে—কিংবা মাখনকে একটা পাতলা আড়ালের ওপাশে রেখে দিয়ে লতা ব্যস্ত হয়ে ওঠে—সবই নিবারণের চোখে পড়ার কথা।

আবার ইস্পাতের পোকা অনিল দত্ত নার্ভাস হয়ে কেন গাঁজার দমে সিগারেটে সুখটান দেয়—কিংবা অতি বিনীত বা অসম্ভব রূঢ় হয়ে পড়ে—তাও নিবারণের না-বোঝার নয়। কিন্তু মায়া হয় তার অনিলের জন্যেই। লতার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। মাখনের বিয়ে অল্প বয়সেই হয়েছে। বড়মেয়ে লিলি সেভেনে পড়ে। অনিল হয়ত লতাকে শুধু চোখের দেখা দেখবে বলে এসেছে। সকালবেলা। মাখন সেভেন আপ হাওড়ায় ফিরেছে। সামনের ঘরে বসে পায়ের মোজা খুলছে। লিলি তার অনিল মামার কাছে অ্যালজেবরা বুঝে নিল এইমাত্র। এক্স-এর অঙ্কে এপাশে পনর দিয়ে গুণ করলে ওপাশেও পনর গুণ করতে হবে। এমন সময় নিবারণ গিয়ে হাজির। অনিল আড়ষ্ট হয়ে যেত।

অনেক, অনেক পরে অনিল দত্ত নিবারণকে বলেছিল, 'নিবারণ, আমি তোমাকে কোনদিন কিছু দিইনি।'

'কেন? রেসপেকটিবিলিটি—প্রেসটিজ—'

'আজ আর ঠাট্টা কোরো না নিবারণ।'

'ঠাট্টা কেন? সত্যিই তো অনিলদা—তুমি বাঁশ দিয়ে ঠেলে না তুললে আমি আজও ফারনেসে আটঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিতাম ফি-দিন।'

'উহুঁ তা নয় নিবারণ। সবসময় আমায় তেল দাও আমি চাই না।'

নিবারণ খুব কষ্ট পেল। অনিলদাকে সে তেল দিতে চায় না। সত্যি কথাগুলো আত্মার নীল আলোর চেয়েও নরম করে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। এই যেমন নিবারণ অনিলকে বোঝাতে পারে না, গাছের একটা রূপ আছে, মেঘের একটা রূপ আছে—তেমনি পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, শিশুর—সবারই একটা রূপ আছে। অনিল দত্ত সাঁইত্রিশে একরকমের ছিল। তখন তাকে পেছন দিয়ে দেখার সময় তার চোয়ালের লাবণ্য আগে চোখে পড়ত। যেমন লতা বাথরুম

থেকে বেরিয়ে ভিজে পিঠে যখন শোবার ঘরে কাপড় বদলাতে যেত—তখন সে খুব সুন্দর হয়ে মাখনের বন্ধু নিবারণ পাকড়াশির চোখে পড়ত। আমরা আসলে কেউ চাই না যে, কোডাকের সেই জাঙ্গিয়া-পরা পিচবোর্ডের মেয়েটা সর্বক্ষণ একই পোজে ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকুক। অদল-বদলই তো নরমাল। কিন্তু কে বোঝাবে। আমি কি রেবাকে বোঝাতে পেরেছি—তোমার দোকানে দোকানে ঘুরে কয়লা যাচাই বাছাই করে কেনার কোন দরকার নেই। কোয়ালিটি কয়লা বলে কিছু থাকলেও তার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে তোমার অর্ডিনারি হওয়ার দরকার নেই কোন।

অনিল দত্ত পরিষ্কার বলেছিল, 'জানো নিবারণ জীবনটা একটা সার্কেল। যেখানে যা করবে—যেখানে যেটুকু পাপ হবে—তার রিটার্ন ঠিক সার্কেলের একজায়গায় তোমার জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকবে।'

ততদিনে ডাফরিনে লতার আরেকটি পুত্রসন্তান হয়েছে। নিবারণের নতুন বাড়িতে লাগানো পেঁপে গাছের ডাঁটিতে রোদ পড়ে নরম কাণ্ড জুড়ে নীল আভা দেয়—তার ভেতরে কালো কুচকুচে দোয়েল এসে বসে—দোলে। তখন একদিন নিবারণ অন্যমনস্ক হয়ে আণ্ডারঅয়ার ছাড়াই ফুলপ্যান্ট পরছিল। হঠাৎ জানালায় তাকিয়েই দেখল, পাশের ফ্ল্যাটের একটি কলেজে-পড়া মেয়ে এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। রাস্তায় বেরিয়ে বুঝেছিল—কেন মেয়েটি তাকে দেখেছিল। আদতে আণ্ডারঅয়ার না পড়ার দরুন সে তখন বিশেষ জোরে কেয়ারফ্রি হয়ে হাঁটতে পারছিল না। এসব কি পাপ।

তখন 'এপারেতে নাইতে নামলে ওপারেতে রুইকাৎলা ভেসে' ওঠার কায়দায় কলকাতার দাঙ্গার সিকোয়েলে পদ্মার ওপারে খুনখারাবি হচ্ছে। করপোরেশনের একজন ছাপোষা চাকুরের অল্পবয়সী বউ-মেয়ে পাসপোর্ট করে ওপারে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল। পাট কেনাবেচা করে এমন একজন লোক তাদের লুঠ

করে দু'জনকেই একসঙ্গে বিয়ে করে ফেলল। চাঁদতারার পোস্টকার্ডে মেয়েটি তার বাবাকে চিঠি লিখেছে—'আমি এখন মায়ের সতীন বাবা।'

কলকাতায় চাউর হয়ে গেল কথাটা। ভাবাই যায় না। গুলিয়ে যায় সব। এতকালের সম্পর্ক নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। একজন পুরুষলোকের দরকারে উলটো করে সাজানো চাই। এসব কি পাপ।

দুপুরবেলা নিবারণ একটা বাসি সিনেমা দেখল। গুড আর্থ। বাপ আর ছেলে একই মেয়েলোকের খদ্দের। তারপর দু'জনে হাতাহাতি লড়াই। একটি মেয়েলোকের প্রয়োজনে কতকালের সম্পর্ক ফিরে সাজাতে হবে দু'জনের। এসব কি পাপ।

রাতে বিছানায় শীতের লেপের নীচে রেবার শরীরে তখন কাঁটা দিয়ে উঠছিল। নিবারণ তখন ওর ওপর শুয়ে শুয়ে ওই দু'দুটো পাপের কথাই বলল। বলে, জানতে চাইল, কেমন লাগছে শুনতে? রেবা তখন এলোপাথাড়ি নামছিল, উঠছিল। এসব শুনে বিশেষ চাঞ্চল্য সত্ত্বেও রেবা কিন্তু মুখে বলল, 'জঘন্য।' এই মিথ্যেও কি পাপ।

অনিলবৌদির টিউমার হল পেটে। আচমকা নার্সিং হোমে চলে গেল। মাখন বলল, তুই আর রেবা গিয়ে একদিন দেখে আয়—অনিলদার খাওয়া-দাওয়া চলছে কি করে। রেবা তো একবেলার রান্না রেঁধে দিতে পারে।

এমন করে ভাবেনি বলে নিবারণের খুব আপশোষ হল। অব অল পারসন অনিলদার জন্যে তার মাথায় এমন একটা আইডিয়া আসেইনি। কত সময় ভেবেছে, অনিলদার জন্যে তার কত কি করার আছে। অথচ এই সময় মাখনের ব্রেন ঠিক ঠিক ভাবে। তার ভাবে না।

পরদিনই সকালে নিবারণ রেবাকে নিয়ে অনিল দত্তর বাড়ি চলে গেল।

অনিল ঘুম থেকে উঠে রেবাসুদ্ধ নিবারণকে দেখে অবাক। তারপর বিরক্ত। রেবা কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে রান্না ঘরে ঢুকতেই অনিল দাবড়ে উঠল, 'আমি হোটেলে খেয়ে নেব। ওসব কি হচ্ছে? চা করে দাও বরং।'

নিবারণ রেবার কাছে খুব ছোট হয়ে গেল। রেবা নিশ্চয় ভাবতে পারে—তার স্বামিরত্ন সস্ত্রীক ওপরঅলা অনিল দত্তকে তেল দিতে এসে ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে স্ত্রীর চোখে স্বামীর ইমেজখানা কি রকম দাঁড়ায়। ফ্লাইং টিকিট চেকার মাখন শালাই যত নষ্টের গোড়া। মাখনকে বোঝে কার সাধ্য!

একদিন বিকেলে নিবারণ পরিষ্কার টের পেল, তার আর কিছুই করার নেই।

তাই বন্ধুদের আড্ডায় চলে গেল। ধুতির কোচাটা আলগা দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে সুশীল, অমরেশ, বিমান ওদের বলল, 'ভাই আমার পকেটে দু'খানা একশোটাকার নোট আছে। তোমরা যদি আমার সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ কর—তবে আমি খুব বাধিত হই! হুররে বলে বিমান চেঁচিয়ে উঠল, মাখন অবধি মদন শা'র দোকানে জুটে গেল। সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছরের বয় বেচু লাজুক লাজুক পোজে ফি রাউণ্ডে টিপসের পয়সা কুড়িয়ে নিতে লাগল। সোডার হিসেব নেই। সবচেয়ে আগে বিমান আর মাখন আউট। মাখন আবার ক্রস করে খেয়ে দারুণ ভুল বকতে শুরু করে দিল। সন্ধ্যে নাগাদ ওরা যখন গড়ের মাঠে গিয়ে হাজির, তখন বল খেলার দল চলে গেছে। কোন্ ক্লাবের একজন মালি বল কুড়িয়ে রাখছিল। সেটা নিয়ে অমরেশ ফাঁকা গোলে শট্ করে দিল।

নিবারণ তিনটে নীট হুইস্কি খেয়ে বেশ ফ্রেস ছিল। অমরেশের রিকোয়েস্টে শেষদিকে মোটে এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে মাথাটা আধমণ ভারি হয়ে গেছে। মাঠের মধ্যে উবু হয়ে বসে নিবারণ গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে লাগল। তখন আর সূর্য নেই। পেছনেই

উনত্রিশ আর চব্বিশ নম্বরের ট্রাম লাইন বরাবর বুকে হেঁটে যাচ্ছে। লিমনেডওয়ালাকে ডেকে সুশীল একবোতল জল ওর মাথায় ঢেলে দিল।

'আমার যে কি লজ্জা করে সুশীল—আমি মিশতে যাই—অথচ পারি না। একটুতেই বমি হয়ে যায়। তোদের একটা ডিস্টারবান্স বিশেষ আমি—'

'এটাতো ভালো সাইন বোকা! তোর বমি হয় মানে লিভার এখনও ভাল আছে। লিভার লিকর নিতে চায় না। আমাদের আর বমি হয় না—', বলতে বলতে সুশীল পকেট থেকে রুমাল বের করে নিবারণের মাথা মুছিয়ে দিচ্ছিল। মায়ের মত। কি সখ্যতা।

আলো কম বলে বড় মাঠের ওপর সব ঘাস কালো দেখাচ্ছিল। তাতে দুই ছোপ বমি। একটা কুকুর ছোক ছোক করছে। 'খুব ট্রাবল্ দিলাম সুশীল—'

সুশীল কি বলতে যাচ্ছিল। চুপ করে গেল। অন্ধকারে কবন্ধ স্ট্যাচুর চেয়েও বেপরোয়া হয়ে অমরেশ বল নিয়ে দৌড়োচ্ছে। যেন ব্যথা লাগার কোন ভয় নেই। তার মধ্যে বিমানের পাশে বসে মাখন একদম বেহেড্ হয়ে 'মাগী! মাগী!!' বলে চেঁচাচ্ছিল।

সুশীল বলল, 'এজন্যেই মাখনটার সঙ্গে পারতপক্ষে আমি বারে যাইনে। আউট হলেই লতার নিন্দে করবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে--

'কেন বলতো?'

'ডোণ্ট আস্ক্? যেমন বুঝ সাধু!'

তখনও বিমান মাখনকে তাতাচ্ছে, 'তাহলে তোর এই ছেলেটা ট্যাবলেটের ভুলে হয়ে গেল বল—'

'বিট্রেয়াল অব ট্যাবলেট বলতে পারিস। এমন ভুলো মন লতার! মাঝে দু'দিন খায়নি। আমায় চিট করেছে মাগী!'

'ও! অন্য কিছু নয় তাহলে। ট্যাবলেটের বিট্রেয়াল!'

ধা করে উঠে দাঁড়াল মাখন। মাঝারি বাঙালীর হাইট। কালো

হলেও বেশ ঝকঝকে কালো, একটু ঝুঁকে পড়ল, 'তুমি কি মিন করতে চাও? পরিষ্কার বল। আমি সবকিছু ক্লিয়ার কাট চাই। রোজ রোজ আর ভাল লাগে না। আমি আর পারি না। আই ওয়াণ্ট এ ফ্রেস স্লেট।'

একটা মিছিল-ভাঙা ভিড় মাঠটা খানিকক্ষণ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

বমি করে নিবারণের মাথা সাফ হয়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় ফট করে মনে পড়ে গেল, গত বছর এ সময়ে একদিন রেবাকে নিয়ে মাখনদের বাড়ি সন্ধ্যে সন্ধ্যে নিবারণ বেড়াতে গিয়েছিল। বাড়িতে কেউ নেই। শুধু লতা জানালার ধারে ফরাসে একা আনমনে বসে। সামনে ওর মরা মায়ের বধূ বয়সের একখানা সেলাইয়ের খাতা খোলা -আগেকার সব ডিজাইন আঁকা। রেবাকে দেখে বসে বসেই বলল, 'এস। এখানটায় বোস।'

রেবা খুব ঘন করে লতাকে দেখছিল, খুব আস্তে করে বলছিল, 'কি ব্যাপার—'

'কিছু না। গা গুলোচ্ছিল—তাই জানলার ধারে হেলে বসেছি।'

'উহু।'

'না না সেরকম কিছু নয়—'

বাড়ি ফেরার পথে রেবা বলেছিল, 'তিনমাসে পড়েছে—'

নিবারণ বলেছিল, 'কাঁদছিল যেন। আমরা ঢুকতেই চোখ মুছে ফেলল—'

তখন, পরে মনে মনে মিলিয়ে দেখেছে নিবারণ, কিছুকাল অনিলদা একদম বোঝা যায় না এমনি ভাবের বিহেবিয়ার করছিল। এই যেমন ঘর বোঝাই বাইরের লোক—তাদের সামনেই, একটু হিসেব না করেই নিবারণকে আনতাবড়ি পর পর দু' দিন বলে বসল —'আই সে গেট আউট—বেরিয়ে যাও বলছি।' নিবারণের যে একটা স্ট্যাটাস বা প্রেসটিজ থাকতে পারে-সে সব হিসেবেই আনার

লোক নয় অনিল দত্ত। অথচ অনিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, মাড়ির তিনটি কষের দাঁত তোলার পর থেকেই কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি করে ফেলে একান্তে নিবারণের কাছে অ্যাপোলজেটিক হয়ে পড়ত। কিন্তু পাবলিকলি সব সময় তার এতকালের দৃঢ়, বীর ও নির্ভীক ইমেজটাই বজায় রাখতে চাইত। মানে বেশি করে আঁকড়ে থাকতেই ভালবাসতো। ব্যাপারটা অনেকখানি এরকম দাঁড়াচ্ছিল—তুমি নিবারণ ভালো করেই জান, আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমি মাঝে মধ্যে বকুনি দিলে সয়ে যেও। পাবলিকলি আমি যাই করি না কেন—তুমি যেন খোলাখুলি ভাবে বিশেষ ট্যা ফো করবে না। তোমার দুঃখ কিসের! আমি তো গোপনে তোমার কাছে একরকম ক্ষমা চেয়েই থাকি। তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?

তবু একদিন নিবারণ প্রোটেস্ট করল।

অনিল বলল, 'আমি তোমার দৌড় জানি। আমার মুখের ওপর তোমার কথা বলার সাহস নেই—আসলে অভ্যেস নেই।'

সেদিন নিবারণকে দমানো গেল না। আর পাঁচজন বাঙালীর মতই রাগলে নিবারণেরও পেট ল্যাঙ্গোয়েজ ইংলিস। তাই বলেছিল, 'ইউ হ্যাড্ এ স্যাবি চাইল্ডহুড্ পারহ্যাপস্!'

'চটলে তুমি খুব সুন্দর ইংরিজি বল নিবারণ। যেমন, আমাদের চমকে দিতে তুমি প্রায়ই সাল তারিখের ডিটেলস্ দিয়ে কথা বল—'

'আমি একটা ভাল স্কুলে পড়েছি ছোট বেলা—সেখানকার অভ্যেস।'

'স্মার্ট হবার চেষ্টা কোরো না।'

'তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের সাল ভুলি কি করে? এসব তো উইকলি, অ্যান্নুয়াল, ফাইনাল সব পরীক্ষাতেই লিখেছি।'

অনিল কোকাকোলা খাচ্ছিল। তার কেন মনে হল, নিবারণ—একান্ত অনুগত নিবারণ তার পরিচিত ইমেজ মুখের ওপর তর্ক করে ভেঙ্গে দিচ্ছে। তাই আচমকা সে খালি বোতলটা নিবারণকে ছুঁড়ে

মারবে বলে উঁচু করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে নিবারণও একখানা হালকা চেয়ার গদা ঘোরানোর ভঙ্গীতে মাথার ওপর তুলে ধরল। লোকজন ছিল। ইমেজরক্ষাকারীরা ছুটে এসে দু'জনকে ধরে ফেলল।

অনিল দত্ত বোতল ছুঁড়তে গিয়েছিল। কথাটা রটে গেল। ফলে অনিল খানিক কেঁচো হয়ে গেল। সেই অবস্থায় নিবারণকে আলাদা ডেকে অনিল বেশ—'ক্ষম হে ক্ষম হে,' কিছু কথা বলল। লতা অ্যাবসেণ্ট। ফ্যাক্টরি অ্যাকটে তিন মাসেব টানা ছুটি পেয়েছে।

নিবারণ বাড়ি ফিরে রেবাকে লুকিয়ে একখানা চিঠি লিখল—

শ্রীচরণকমলেষু—

অনিলদা, তুমি আমাকে রেসপেকটিবিলিটি ও প্রেসটিজ দিয়েছ। আমি তেমন বিশেষ কিছু তোমাকে দিতে পারিনি। আমি জানি ইদানীং তুমি কেন এত আপসেট। আমার সে সব বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই কোন। তবে আমার একটা বিষয়ে কিছু বলার আছে। তোমার যদি আমাকে মাঝে মাঝে ইনসাল্ট বা খুন করার ইচ্ছে হয় তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে ব্যাপারটার আমি কোন সাক্ষী থাকা পছন্দ করি না। তুমি আমাকে গোপনে ঘরে ডেকে কিংবা সন্ধ্যেবেলা গঙ্গার পাড়ে নির্জনে নিয়ে গিয়ে কুড়োল দিয়ে আমার মাথার পেছনে ঘা দিতে পার। এতে আমার কিছু আপত্তি করার থাকবে না। ইতি—

প্রণত নিবারণ

একদম খাঁটি সোলের কথা। এসব কথা নিবারণ টের পায়—তার বুকের ফুটো দিয়ে ফিলটার হয়ে বেরিয়ে আসে। তাতে নীল আলো-মাখানো থাকে। চিঠি পেয়ে মূর্খ অনিল দত্ত ভাবল, সাময়িক বিদ্রোহের পর নিবারণ তার চিরাচরিত আনুগত্যে ফিরে এসেছে। চিঠিখানা পুরোপুরি সাবমিশনের। তাই চিঠি হাতেই নিবারণকে ডেকে পাঠালো, চেয়ারে বসার ভঙ্গী খুবই কনফিডেণ্ট, 'এ-যে একেবারে জয় সিংহের মত—'

অনিল দত্ত রবীন্দ্রনাথের কিছু নাটক পড়েছিল—সেকথা নিবারণ জানে। নাটক, থিয়েটার, নভেল নিবারণের দু'চক্ষের বিষ। লোকের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে কিছু নিষ্ঠুর লোকের লেবু চটকানোর কারবার—তার চেয়ে বেশি কিছু না।

'নিবারণ আমি আপসেট ঠিকই। বুঝতে ভুল করনি।' তারপর হঠাৎই বলল, 'কিন্তু আমার স্ত্রীকে আমি নিদারুণ ভালবাসি—সেখানে আমি অটল।'

অনিল খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে বোঝাই যাছিল।

নিবারণ বলল, 'এসব ব্যাপারে আপনি সিওর না। আমরা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারি না। হার্টের ভেতরে সব সময় নীল আলো পয়দা হচ্ছে—ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আমরা আলো বুঝতে পারি না—তাই যত গোলমাল। আলো দেখতে পাই না—তাই যত মুশকিল।'

অনিল গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ডিরেঞ্জড্ নিবারণ। তোমার কোন গোলমাল চলছে।' তারপর খুব হাসতে হাসতেই বলল, 'তুমি বোধহয় হোমো—'

নিবারণ বুঝলো, তার এই চিঠি, অনিলদার তাবৎ নিষ্ঠুরতা প্যাসিভ মুডে মেনে নেওয়ার মানে দাঁড়িয়েছে—সে একজন হোমো।

'তুমি হয়ত সমকামী। সমকামীরা ভালবাসেও গভীরভাবে। তুমি তাই আমাকে বলেছ—আমি যেন তোমায় নির্জনে নিয়ে গিয়ে খুন করি!'

'আমি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ পড়িনি অনিলদা। গল্পগুচ্ছের ফাস্ট পার্টে বনমালী সীতাংশুমালী নামে দু'ভাইয়ের গল্প আছে একটা। গরমকালের সন্ধ্যায় বিচ্ছিন্ন দুই ভাই পাশাপাশি বাড়িতে বসে আমবাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে-যাওয়া হাওয়ার শব্দ শুনতো—ভালো বাংলায় বলতে গেলে, তারা বিচ্ছেদ, ছাড়াছাড়ি মর্মরিত হচ্ছে শুনতে পেত। সবই স্মৃতি থেকে বলছি। ভুল হতে পারে। গল্প-নাটক

আমার ফেবারিট নয়—তাই ঠিক ঠিক বললাম কিনা সন্দেহ আছে। এখানে হোমো কোন ব্যাপার নেই নিশ্চয়।'

'ঠিক মনে পড়ছে না গল্পটা।'

'আসলে জীবনে আমাদের করার আছে একটাই—'

'কি রকম?'

'শুধু মেশামিশি। অষ্টপ্রহর ভালবাসাবাসি। বুকে বুক ঠেকিয়ে দেখ অনিলদা—তাও আমরা কেউ সংলগ্ন নই—আসল অর্থে সংলগ্ন নই। বুক অব্দি পৌঁছে ঠেকে থাকি। আর এগোনো যায় না। তখন এই সব স্থূল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—বুকের বেড়া আমাদের হাড়পাঁজর ভেদ করে আরও খানিক মিশে যাওয়া আটকে রাখে।'

'রেবা কি বলে?'

'ওর বলার কিছু নেই। আমি ওর অনেকখানি ভেতরে যেতে চাই। সেফ পিরিয়ডে অনেকদূর চলেও যাই। কিন্তু ইদানীং তাও আর যেতে পারছি না।'

অনিল দত্ত তাকিয়ে আছে দেখে নিবারণ পাকড়াশি গল গল করে বলে দিল, 'আমি জানি না কি হয়েছে আমার। কিছুকাল হল সেফ দিনগুলোতে ওর ভেতরে একদম যেতে পারছি না। ডগা নেমে যায়—বেঁকে যায়—নুয়ে পড়ে। তখন যে কি স্যাড্ অনিলদা। মনে রাখা দরকার আমি তখন দুনিয়ার সবচেয়ে ক্লেভার, সবচেয়ে একজাকটিং অ্যানিমালের ওপর শুয়ে। আচ্ছা অনিলদা একটা জিনিস ভেবে তোমার দুঃখ হয় না? কত ভালবাসাবাসি, কত দেবা টেবি ভেবে কিশোরবয়সে আমরা সবাই স্বপ্ন বানাই। কিন্তু প্র্যাকটি-ক্যাল ফিল্ডে এসে দেখি আমরা সবাই এক একজন কম্পাউণ্ডারকে বিয়ে করে বসে আছি। সে সব সময় দশ মিলিগ্রাম কপট অভিমানের সঙ্গে সোডিবাইকার্ব মিশিয়ে তাতে দলাইমলাই হওয়ার পাউডার ঢেলে খলে বেশ করে মাড়ছে। আমাকে কামড়াও—আমাকে থেতলে দাও—'

থেমে পড়তে নিবারণ দেখল অনিল তার দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে।

'অথচ এমন তো কথা ছিল না অনিলদা! কি স্বপ্নে ছিল। আর হাতে কলমে রোজ কি দেখছি! ভালবাসায় আমরা সবাই যেতে চাই। কিন্তু এমনি শুধু হাতে যাওয়া যাবে না। শরীর ঘাটাঘাটির পাকা রসুই না হলে সব বরবাদ। তোমার মনে যতই প্রেম থাকুক—তা যতই সূক্ষ্ম হোক—তাই তোমাকে পাস করতে হলে ওকে ময়ানে ডুবিয়ে লেচি পাকাতে হবেই—'

বোঝাই যায়, অনিল দত্ত এতদূর ভাবেনি। ঘরের হাওয়া ভারি হয়ে যাচ্ছিল। কট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল একটু রিলাক্স করা যাক্।'

ম্যাঙ্গো লেনের অফিস ছাড়িয়ে খানিক এগোলেই অনেক রকমের দোকান। একটায় আবার কাগজের লণ্ঠনে ডুম জ্বলে। সেখানে রঙ মাখানো পেঁয়াজ দেয় ফিস ফিংগারের সঙ্গে। বাজনা হচ্ছিল। বছর তিরিশের একজন মেম ছোট্ট একটা ফ্রক পরে—'আ-হা-হা-হা জানে না য্যানো,' ঢঙে বসে আছে।

অনিলের চোখের পাতা তিনপো টাইমের ভেতর ভারি হয়ে গেল। তখন বলল, 'জানো নিবারণ আমি খাঁটি মফস্বলের ছেলে। একবার ফাইভ সিক্সে সরস্বতী পুজোর ভোরে ফুল চুরি করতে গিয়েছিলাম এস ডি ও-র বাংলোয়। শেষরাতে থোকা থোকা গাদা ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি কোঁচড়ে ফেলছি—এমন সময় সপাং করে পিঠে চাবুক পড়ল। ভোর রাতে ফিরে তাকিয়ে দেখি এস-ডি-ও-র বেণী বাগানো মেয়ে—হাতে চাবুক। সে যে কি দীনতা—সে যে কি অপমান—'

'চলে এলেন?'

'ফুলগুলো ফেলে রেখে চলে এলাম। তারপর আমি আর কোনদিন প্রেম পাইনি। ভালবাসা কি জিনিস জানি না। ঘুরে

বেড়াই—ছুটে যাই। তবু পাই না। নাও আরেক পেগ নাও—' বলে অনিলদা তার গ্লাসের সবটাই নিবারণের গ্লাসে ঢেলে দিল।

'আপনি নেবেন না?'

'আমি আর খাব না! খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। খেলে আর বলতে পারব না।'

'আমি আজকাল রাতে শুয়ে শুয়ে রেবাকে চটি বই পড়াই।'

'কেন?'

'আমি যে অনিলদা মোটা দাগের সেই সব কাজ জানি না।'

'কিরকম?'

'ওকে তৈরি করে দেয় ওসব বই। তারপর আমার পার্ট আমি প্লে করি। ভেবে দেখুন—শুধু তদ্গত হলেই চলবে না। বিধির নিয়ম! আরেকজনকেও তদ্গত হয়ে উঠতে হবে। কি রিডিকিলাস!'

'লতার জন্যে আমি আবার নতুন হয়ে উঠছি।'

'ওকি আপনাকে রিয়ালি ভালবাসে? বুঝতে পারেন আপনি?'

'মনে তো হয়। কত জোরে আমায় জড়িয়ে ধরে নিবারণ। তুমি যে বললে বুকের ভেতরের নীল আলো ভালোবাসায় বেরিয়ে পড়ে—তাই হয় ঠিক। আমি কত লিভিং হয়ে পড়ি। গোড়ায় গোড়ায় নিবারণ আমারই দ্বিধা ছিল দারুণ। আমার বয়স—আমার গোঁফ—'

'হো হো' করে হেসে উঠল নিবারণ।

'হেসো না। আমি যা বলছি ঠিকই। আমি—আমার এই গোঁফ এখনকার নয়।'

'কবেকার!'

'দুর্গাদাসের 'প্রিয়বান্ধবী' দেখেছ? ওঁর শেষ ছবি?'

'না।'

'তারও তিন চার বছর আগে দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্যে কি একটা ফিল্মে এই গোঁফ প্রথম বাঙালী দর্শককে উপহার দেয়। তখন আমরা

কলেজে যাচ্ছি। সেই সময় থেকেই এভাবে গোঁফ ছেঁটে আসছি। জানতাম না লতা কিভাবে নেবে। ও কিন্তু দিব্যি অ্যাকসেপ্ট করল।'

'এই যে বলছিলেন পত্নীপ্রেমে আপনি অটলবিহারী!'

'মানে?'

'একেবারে কট্টর লাভার!'

'সেকথা তো মিথ্যে নয়। একটু সোডা মিশিয়ে নাও নিবারণ। আমি তো রোজ ছুটে যাই ওর কাছে। ভালবাসবো বলে। ভালবাসবে বলে। আমাকে নিয়ে কি করবেন আমার ধর্মপত্নী বুঝতে পারেন না—লতাকে নিয়ে কি করব আমিও বুঝে উঠতে পারি না। লতার কোমরের পর থেকে ম্যাপ দেখে দেখে যত দক্ষিণে নামি নিবারণ—তত আমি বুঝে উঠতে পারি না কি করব? আমার কি করার আছে? আমি কে হরিদাস পাল সেখানে? তখন বুক দিয়ে দু'হাতে জড়িয়েও থৈ পাওয়া যায় না। আরেকটু নাও নিবারণ—হিউম্যান বডি হে এরকম তা আগে জানতাম না।'

'আমি নিচ্ছি। আপনি নিন না।'

এবার নিবারণ ঢেলে দিল বেশ খানিকটা। সোডা অনেকক্ষণ ফুরিয়ে গেছে। অনিল মাথাটা পেছনে ফেলে দিয়ে সবটাই আগাগোড়া নিট মেরে দিল। কোঁৎ করে আওয়াজ হল। তারপর মাথাটা সোজা করে বসতেই অনিল দত্ত একেবারে অন্য লোক, 'তুমি একটি যদু। য স্থানে চ।'

একে বলে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধানো। নিবারণ তখনও ঠিক আছে। চিবুকের তিন ইঞ্চির ভিতরে মুখের একটা জায়গা শুধু আপনা আপনি কুঁচকে যাচ্ছিল থেকে থেকে।

'নিজে টাইট থেকে শালা পরের কথায় এত খোঁজ কেন? লতাকে একদিন চেয়ে পাসনি তাই না!'

অনিলদা বড় অ্যাসট্রেটা নিবারণকে সোজাসুজি ছুঁড়ে মারল।

মুখে হাসি রেখেই সেটা লুফে নিল নিবারণ। নয়ত একদম আউট অবস্থায় অনিল আরও চটে গিয়ে কি যে করে ফেলতে পারে তার ঠিক নেই। এখন নিবারণ সুবিধা বুঝে অনিলের পেট সাবজেক্ট—'এই তোমাদের চেয়ে আমরা কতখনি দড়' তা নিয়ে মোটামুটি একটা আলোচনা ফেঁদে ফেলতে পারে। তার জালে জড়িয়ে অনিলকে যে কোন উপায়ে সাবধানে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

অনিল বেশ জোরে নিবারণের গালে একটি চড় দিয়েই দামী হাত ঘড়িটা কার্পেট মোড়া মেঝেয় ফেলে দিল, তারপর নোটে বোঝাই মানিব্যাগটাও। অনিলকে সাবধানে ধরে ফেলে সেগুলো কুড়িয়ে নিল নিবারণ। তারপর বাঘ যেভাবে জল-খেতে-আসা মহিষের টুঁটি কামড়ে এক ঝটকায় পিঠে ফেলে ছোটে, প্রায় সেইভাবে, অনেক সুখে ভাসতে ভাসতে একটা ট্যাকসি ধরে ফেলল। ট্যাকসিঅলা অনিলদার বাড়ির দিকে যেতে চাইল না। তখন অগত্যা নিজের বাড়ির দিকেই ট্যাক্সিকে যেতে বলল।

'তুই কি ভাবিস হারামজাদা। তোকে আমি চিনি না? মেনি বেড়াল!'

'ইয়েস—'

অনিল তখন আঙ্গুলের সুখ করে নিবারণের ঝুলপি ওপরের দিকে ঘসছিল, 'আমি পই পই করে বলেছি না—আমার পেছনে ঘুর ঘুর করবি না। আমাকে তোর তেল দেওয়ার কোন দরকার নেই। একের নম্বরের ন্যাকড়া!'

অনিলের সারা শরীরটা তখন প্রায় নিবারণের গায়ে ঢলে পড়েছে। তাতে ন্যাপথালিনের পাতলা গন্ধ। লাল আলো পেয়ে খাদি গ্রামোদ্যোগের বাড়ির সামনে গাড়ি ঘচ্ করে থেমে যেতেই অনিল এক পাক খেয়ে দরজা খুলে ফেলে পিচ রাস্তায় পড়ে গেল। ঠোঁটবিহীন একদল ভিখারি দু'পাটি দাঁতের অরিজিন দেখাতে দেখাতে দাঁড়ানো গাড়ির সারির ভেতরে পয়সা চাইতে চাইতে এগিয়ে

আসছিল। তাকে পাশ কাটিয়ে অনিলদা অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীর কায়দায় একটা মোটা হোস পাইপ হয়ে কোনক্রমে ফুটপাতে গিয়ে উঠল। ট্যাকসিঅলাকে পাশে দাঁড়াতে বলে নিবারণও ছুটে গেল। ততক্ষণে অনিলদা একছুটে খাদি গ্রামোদ্যোগের কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিবারণ দৌড়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াল, হাঁসফাঁস করে দম নিতে নিতে সেলস্‌ম্যানকে বলল, 'একটা তসরের পাঞ্জাবী দিন।'

'কার সাইজের?'

'এনার। আটত্রিশ সাইজ হবে?'

অনিল পর্দার আড়ালে যেতে রাজি হল না। ফলে ট্রাউজারের ওপরেই অনিল পাঞ্জাবী গায়ে দিল। খুব ফিটিং হয়েছে। কি সুখ নিবারণের। আজ আচমকা সে এই লোকটাকে তার হাতের মধ্যে পেয়ে গেছে। পাওয়ার কথা নয়। নেশা ধরেছিল বলে। পেছন থেকে অনিলদার সেই দশ বছর আগেকার লাবণ্যমাখানো চোয়াল দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এখন ঠিক এই মুহূর্তে অনিলদার বুকের ভেতর থেকে আত্মা বা সোল—যাই হোক্—তার নীল আলো চারদিকে ছিঁটিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানে পৌছনোর একমাত্র বাধা বলতে আমার এই শরীর। এই হাত-পা, বুকের হাড়-পাঁজরের মলাট। এসব যদি এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলা যায়—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অনিলদারটাও ছিঁড়তে হবে—যদি এই দোকান, দোকানের লোকজন সাক্ষী ইত্যাদি লোপাট করা যায়—তাহলে সেখানে পৌছনো কত ইজি। অবশ্য অনিল দত্তর গোঁফ এখানে নাইন্টিন থার্টিসেভেন এইটের একমাত্র রেলিক হয়ে পড়ে থাকবে।

'তোমার ছেলের বয়স কত?'

'বড় হয়ে যাচ্ছে রোজ।'

'রেবার বয়স কত?

'তা আঠাশ তিরিশ হবে বোধ হয়—'

অনিল আর কথা বলতে পারছিল না। চোখ বুজে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে হাতির দাঁতের রকমারি শোকেসের সামনে এসে দাঁড়াল। নিবারণের হাতে তখন অনিলের ছেড়ে ফেলা জামা, ফাউন্টেনপেন, হাতঘড়ি, রুমাল, মানিব্যাগ। একছড়া হাতীর মালা আর ছোট ছেলেদের পাঞ্জাবী, বুকের জন্যেও হাতির দাঁতের বোতাম কিনে ফেলল অনিল, 'তোমার বাড়ি যাচ্ছি তো আমরা? তারপরই হঠাৎ ছোঁ মেরে মানিব্যাগটা কেড়ে নিল অনিল, 'কেন যে ছিনে জোঁকের মত লেগে আছিস আমার পেছনে।'

ক্যাস কাউন্টারে নিবারণ অনেক কষ্টে পাঞ্জাবির দাম দিল। অনিল দিল মালা আর বোতামের দাম। তারপর একখানা নৌকো যেভাবে ভাজ করে রোয়িং ক্লাবের সখের নাবিকরা কাঁধে ফেলে পাড়ে উঠে আসে—অনেকটা প্রায় সেইভাবে ট্রাউজারে, নতুন পাঞ্জাবীতে মোড়া অনিলকে প্রথমে ট্যাকসিতে—তারপর নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে এল নিবারণ। এভাবে এর আগে অনিল কোনদিন আর এতটা ধরা দেয়নি নিবারণের হাতে।

সন্ধ্যের ঝোঁকে ছেলেটা না খেয়েই ঘুমিয়েছে। গরমকালে সমুদ্র থেকে উঠে এসে সন্ধ্যেবেলা যে বিখ্যাত বাতাস কলকাতাকে আলুথালু করে দিয়ে সারাদিনের ভাপতাপের পর প্রায় একরকম তালপাখা হাতে কাছে বসিয়ে হাওয়া করে--তারই খানিকটা শহরতলীর এ-পাড়ায় বয়ে যাচ্ছিল। আশেপাশে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। মিস্ত্রিরা সারাদিনের কাজের পর টেম্পোরারি ছাউনির বাইরে রান্না চাপিয়েছে! রীতিমত খিদে চনমন করে ওঠে এমন সব গন্ধ ভেসে আসছিল।

অনিলের খুব ভাল লেগে গেল। সেই বিচিত্র বেশে ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগল। সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নিবারণ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল—তারই নিজের বুকের ভেতরে খুবই মৃদু তালে একটা একটা বাজনা আপনা আপনি বেজে চলেছে। মনে হবে কেউ

এগিয়ে আসছে। আবার সন্দেহ হবে—কেউ বুঝি বা একা একা ফাঁকা বাড়িতে হঠাৎই ঢুকে পড়ে কাউকে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

'এত সুন্দর চৌবাচ্চা বানিয়েছ। আমায় বলনি তো—'

'চৌবাচ্চা নয় অনিলদা। মেঝে ভরাটে খানিকটা মাটি কম পড়েছিল। বর্ষাকাল। তাই খুদে সুইমিং পুলের স্টাইলে মাটি তুলে নিয়েছিলাম। বর্ষার জলে এখন টলটল করছে।'

কিছু বুঝতে না দিয়ে অনিল পট পট করে পাঞ্জাবী, ট্রাউজার খুলে শুধু আণ্ডারঅয়ার পরেই সেই স্লিপারি মাটির চৌবাচ্চা—বিশ বাই বারো ফুট—খুদে জলাধারে নেমে গেল, 'ওয়াণ্ডারফুল! একখানা সাবান দিতে পার?'

রেবা সাবান, তোয়ালে নিয়ে ছুটে এল। ঘর থেকেই সব শোনা যায়। তাকে দেখে কোমর জলে দাঁড়িয়েই অনিল বলল, 'ইটি তোমার পরিবার?'

বহুদিন পরে রেবা তার নিজের মত করে হেসে ফেলল। সঙ্গে নিবারণও হাসল।

ঠাণ্ডা জল মাথায়, শরীরে লাগতেই অনিলের নেশা ঝাঁ ঝাঁ করে চড়ে গেল। তখন সে জলে সারা শরীরটা আগাগোড়া ভাসাতে গিয়ে এলোপাথাড়ি পা দাপাতে লাগল, দু'বার জল খেল, উঠোনের আলোয় চোখ লাল হয়ে যাচ্ছিল পরিষ্কার দেখা গেল। ততক্ষণে নিবারণের পুরনো নেশাটাও গোলাপি রেশ কাটিয়ে একটু একটু করে টঙে উঠতে লাগল। তার সন্দেহ হল, অনিলদা ডুবে যাচ্ছে—তাঁকে বাঁচানো দরকার। তাই দু'হাতে সাঁতার শেখানোর পোজে নিবারণ অনিলকে প্রায় তুলে ধরল। অনিলও প্রায় ক্যাচিং অ্যাট এ স্ট্র কায়দায় নিবারণের 'কণ্ঠ পাকড়ি' উঠে এল। উঃ! ভাবাই যায় না। অনিলদা এতখানি কাছে এসে যাচ্ছে। নিবারণ ততক্ষণে তার স্বপ্নে পাওয়া ইউরোপে বার্থগেস্টনের শৈলাবাসে হিটলারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনটি ইহুদিকে আগাগোড়া ছাড়ানোর পর তাদের নিটুট তিনটি আত্মা সামনেই টেবিলের ওপরে ম্যাগনাম সাইজের বয়মের ভেতরে স্যালিসিলিক অ্যাসিডে ভাসছে। সেখানে বুকের কোন ব্যারিকেড্ নেই। হিটলার ভদ্রতা করে একখানা কাঠি নিবারণের হাতে ধরিয়ে দিল, 'আপ পহেলে—'

'নেহি নেহি আপ পহেলে—'

'নেহি আপ—'

'তোবা! তোবা!! মাপ কিজিয়ে গা। আপ পহেলে—,' ভদ্রতায়, বিনয়ে হিটলারের চোখে জল এসে গেল।

অগত্যা নিবারণেরই বয়মের ঢাকনা খুলে ফেলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনদিকে ভাসমান—মুদির দোকানে বাসি মাখনের দলা মাটির হাড়ির ভেতরে এমনি ভাবেই তো আলাদা আলাদা ভেসে থাকে —তিন দলা আত্মা একসঙ্গে নিবারণের মুখের ওপর—বয়মের বাইরে অবধি নীলচে মোলায়েম আলো উপচে পড়ল—বা, বলা যায় উথলে গেল—সোজাসুজি বলাই ভাল, ঠিকরে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

গোয়েরিং বলল, 'উহু ওটা ছোঁবেন না। ছোঁবেন না।'

নিবারণ কাঠি দিয়ে আলগা ধাক্কা দিয়ে আত্মাগুলো একজায়গায় করে দিচ্ছিল—যাতে ওরা মেশামিশি করতে পারে। 'কেন?'

চোখ থেকে চশমা নামিয়ে গোয়েবেলস্ বলল, 'নিবারণবাবু, ওটি মাদী ইহুদির—'

'তাতে কি হল!'

এবার স্বয়ং হিটলার জবাব দিল, 'একেবারে রক্তশূন্য। ওদের কোন ভালবাসা নেই। ওদের একদম ভালবাসা যায় না।'

'নিবারণ আমার লাগছে—লাগছে। উঃ! ছেড়ে দাও বলছি—', নিবারণের গা থেকে স্লিপ খেয়ে অনিল জলের মধ্যে আবার খসে পড়ল। পড়েই জলে দাপিয়ে বুক অবধি ঠেলে উঠল, 'এসব কি

হচ্ছিল শুনি। আমি বুঝি না—' বলতে বলতে অনিল আবার টলে গেল। নেশার ভারে জলেও মোমবাতি হয়ে ঢলে যাচ্ছিল।

নিবারণেরও খুব ধরেছে। হেসে বলল, 'তোর কোন জ্ঞান নেই অনিল। তুই শিশু। পড়ে যাচ্ছিস বার বার—তাই ধরে রাখছিলাম। আয় শুয়োর কাছে আয়—আয়—'

'তাই বলে ওভাবে—অতজোরে কেউ গলা জড়ায়? আমি বুঝি না!' ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে রেবার হাত থেকে একখানা থালা পড়ে ঝন্‌ঝন্ করে বাজতেই থাকল। তারই ভেতরে অনিল বলল, 'এঃ! কাদা লেগে গেল গায়ে—', দূরে কাদের বসতবাড়ি থেকে ঘ্যান ঘ্যান করে একটা রেডিও একটানা রবীন্দ্র সঙ্গীত বমি করছিল।

'আয়। কাছে আয়। সাবান মাখিয়ে দিই।'

'না যাব না। তোর হাতে আমার ভয় করে কেমন। গা ঘিন ঘিন করে ওঠে—'

'ওসব তোর ভুল। আমি অন্য কথা ভাবতে গিয়ে তোর গলায় আমার হাতের ভাঁজ কনুইসুদ্ধ চেপে বসিয়ে রেখেছিলাম। মনে ছিল না কিছু। আয় না। কোন ভয় নেই বলছি। কাছে আয়—'

'বেশ। শুধু পিঠে মাখাবি।' হঠাৎ ঘুরে বসল অনিল, 'আচ্ছা বলতো তোর এত সাবান মাখানোর সাধ কেন? গাত্রমার্জনা! বাঞ্চোৎ!' বলেই অনিল পিঠ এগিয়ে নাইকুণ্ডুলি জলে ডুবিয়ে বসল। বিখ্যাত সামুদ্রিক হাওয়া সেখানেও এসে হাজির হল। সবকিছু সুখদায়ক তখন।

সাবান ডলতে ডলতে নিবারণ দেখল অনিলের জামা ঢাকা কতকালের পিঠ দু'চারটে সুখ-তিলে স্পটেড্। মানুষের দেহের একখানা নভেল প্যানেলের ব্যাক সাইডের ভিউ। বুক আছে ওপিঠে। আমরা কতজোরে জড়িয়েও এইসব বাধা পেরোতে গিয়েও পারি না। বিলকুল এসব জায়গাতেই থেমে থাকি।

'তুই কি জানিস তুই কত বড় ইল্‌লিটারেট্ অনিল।'

'বক বক করিসনে। এখন একটু হুইসকি হলে খুব জমতো। আসলে আমি তোকে চিনি নিবারণ। তুই আদতে হানড্রেড্ পারসেণ্ট তিলে খচ্চর।'

'তোর এসব ভাষা আমি বুঝি না। তুইও আমার ভাষা বুঝবি না।'

সাবানের ফেনায় অনিল স্লিপারি হয়ে যাচ্ছিল। নিবারণ ধরে রাখতে পারছিল না। উঠোনের যেটুকু আলো বাইরে এসে পড়েছে তাতে একসময় রেবা কখন উঠে এসে কাগজে মোড়া পালকসুদ্ধ মুরগির ছালটুকু ছুঁড়ে দিয়ে গেছে আদাড়ে। মালিকহীন বেড়াল এতক্ষণে তা গন্ধে গন্ধে খুলে ফেলে বোকা বনে গেল অনিলেরই চোখের সামনে। কি পটু ওয়াইফ্। কি সুইফট। তার বউ একযুগ আগে এই বয়সে ছিল।

'কেন?'

'তুই ভাবিস আমি হোমো। তার বাইরে—কিংবা আরেকটু ওপরে উঠে আরেকটু কিছু ভাবতে পারিস না।'

'যেমন?'

'আমরা মেশামেশি ছাড়া বাঁচবো না অনিলদা।'

খচ করে অনিলেরও মনে পড়ল—সে একজন অনিল দত্ত। অরিজিন্যাল অনিল দত্ত। নিবারণের বাইসেপ সাবান ঘষার সামান্য ঝাঁকুনিতে চমকে স্থির হয়ে আছে। একদা ব্যায়াম করত। অনিল সেদিকে তাকিয়ে দেখল, নিবারণের চোখের গর্তে আগেকার লিমনেডের ছিপির ধারা. দু'টি স্বচ্ছ কাচের গুলি বসানো। তাতে একটু একটু করে ভাব ফুটে উঠছে।

'তুমি এত তুখোড় হতে চাও কেন? অনিলদা তুমি এত ব্রাইট, ব্রিলিয়াণ্ট হয়ে থাকতে চাও কেন?'

'নেশাটাই মেরে দিলি বকবক করে। কি বলছিলি আবার বল। তোর বউয়ের প্রেসার কুকার সেই থেকে এমন শিসোচ্ছে—'

'সাবমিশন কি জিনিস তুমি জানো না—'

'মানে ম্যাদামারা হয়ে থাকা—'

'ধরা দিয়ে যে কি স্বাদ তা তুমি জানো না। ধুলোয় লুটিয়ে ন্যালাক্ষ্যাপা হয়ে থাকো—তোমার ভেতর দিয়ে তখন সোলের আলো পাশ করবে—তখন তুমি অদৃশ্য সব কিছু কত সহজেই দেখতে পাবে —অ্যাট ইজ—'

'যেমন তোর বেরোয় মাঝে মাঝে!'

নিবারণ তাকিয়ে পড়ল। তাহলে কি আমার বেরোয়! কোথায়! আমি তো জানি না।

অনিল দেখল, তার সারা শরীরে খুব আনন্দ হচ্ছে। নেশার ঝাঁকুনি কমে গিয়ে খাঁটি ঘুম পাচ্ছে। নিবারণদের খুদে জলাধারের গায়ে নতুন বসানো ফুলের চারায় একটি দু'টি কুঁড়ি ধরেছে। কম্পাউণ্ড ওয়ালের ওপর কাচের কুচির সারি আলো পেয়ে ঝিকিয়ে গেল।

অনিল বলল, 'কেমন কি না!'

'কিসের আবার—'

'পকেটে নোট ভরে নিয়ে গিয়ে তুমি ফ্রেণ্ডসিপ কর। হাতে ধরে ধরে বল—আয় আমার সঙ্গে মিশবি? লতা বলেছিল, হাসতে হাসতেই, তুমি নাকি কুইয়ার। ফি দিয়ে মেশামিশি করতে চাও। আমি বলি—নিবারণ, ভালো করে শোন—তুমি ডাক্তার দেখাও। তোমার কোন গণ্ডগোল আছে। হাসছিস কেন? সিরিয়াসলি বলছি ঃ তুমি ডিরেঞ্জড্।' তারপর আচমকাই একলাফে ওপরে উঠে গেল অনিল, খুব জোরে রগড়ে রগড়ে গা মুছলো, 'শালা মারবো গাড়ে এক লাথি! ভালবাসা কি বাজারে ফিরি করে ফেরে!'

নিবারণও উঠে পড়েছিল। অনিল তোয়ালেটা তার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বাঁধানো চাতালে প্রায় নেচে উঠলো, চোখ ঘুমে ঝুলে যাচ্ছিল—

তবু গেয়ে ফেলল, বেশ সুর দিয়েই, 'মদিরা বয়েঠ্‌কে বিকে·····
বুঝলে চাঁদ।' ফিরিয়ে গাইল কলিটুকু। 'বেরিলিকে বাজারমে
ঝুমকা খো গ্যয়ে' সুরে।

অনিল একা একা সিঁড়ি ধরে ঘরে উঠতে গিয়ে টলে গেল।
নিবারণ এবারও ধরে ফেলল। রেবা একজোড়া কাচা পাজামা
তারে ঝুলিয়ে রেখে গেছে। তার একটা হাতে তুলে দিয়েও দেখা
গেল, অনিল একা একা পরতে পারছে না। নিবারণও খুব ভালো,
পরিষ্কার, সোজা বড় একটা কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। সেই অবস্থায়
উঁকি দিয়ে দেখল, রেবা দারুণ মগ্ন হয়ে খাবার টেবিলে স্যালাড
সাজাচ্ছে।

মাথা যেটুকু পরিষ্কার ছিল, তাতে নিবারণ এটা বুঝতে পারল,
ভিজে আণ্ডারঅয়ারের ওপর অনিলদার পাজামা পরে ফেলা ঠিক
হবে না। আণ্ডারঅয়ার ছাড়ানোর সময় অনিল দত্ত ঠায় দাঁড়াতে
অসুবিধে দেখে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে নিল। তখন নিবারণ
চাতালে উবু হয়ে বসে ভিজে আণ্ডারঅয়ারটা অনেক কষ্টে হাঁটুর
নীচে নামাচ্ছিল।

সেই অবস্থায় নিবারণের মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গীতে কোনক্রমে
ডান হাতটা ঠেকিয়ে অনিল বলল, 'তোর মনোলগ এত লাউড্‌ হয়
কেন রে নিবারণ! বয়স বাড়লে দেখবি—যা নিয়ে তোর ভেতরটা
গুলোচ্ছে—তা কত ইনসিগনিফিকেণ্ট্‌।'

পাজামা পরিয়ে গিঁট বেঁধে দিল নিবারণ। তারপর নিজেও
একটা পরে নিল। দু'জনেই কোনরকম কনসাল্ট না করে চাতালের
লাগোয়া বারান্দায় বসে গেল, পা ঝুলিয়ে।

'মাই রিকোয়েস্ট অনিলদা—একবার বুক ভরে বলে ফেল—
আমায় তোমরা চাকর রাখো। বাসন মাজবো, কাপড় কাচবো,
গোহালে সন্ধ্যে সন্ধ্যে সাঁজাল জ্বেলে দেব—কত সুখ বলো। করে
কত সুখ। তখন আর নিজেকে নিয়ে চিন্তা থাকে না কোন।'

মুরগিটা ডিম দিচ্ছিল নিশ্চয়। প্রেসার কুকারে সেদ্ধ হলেও রুঠো রুঠো। খেতে বসে নিবারণ বা অনিল কোন কথা বলছে না দেখে রেবা কিছু মিইয়ে গেল। এটা সেটা এগিয়ে দেবে বলে ফ্রিল লাগানো একটা ব্লাউজ পরে এসে দাঁড়িয়েছিল। নতুন তৈরি বাড়ি। মোজাইক আজও সকালে সোডা দিয়ে ঘসা হয়েছে। সানমাইকা লাগানো টেবিলের মাঝখানে প্লাস্টিকের শাদা ফুল কচি কলাপাতা রঙয়ের বোঁটাসুদ্ধ আগাগোড়া ধোয়ামোছা। বাড়িটা নিঃশব্দ। দু'জন আধো ঘুমন্ত লোক আন্দাজে মাংস খাচ্ছিল। একজন কড়মড় করে একখানা পা চিবোলো—অন্যজন পাঁজর চুষতে গিয়ে ম্যানেজ করতে পারছে না। শেষদিকে একটা কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে অনিল জেগে গেল। হাত মুখ ধুতে দু'জনকেই বেসিনে রেবা জল ঢেলে দিল।

বসার ঘরের বড় পালঙ্কে পাশাপাশি নরম বিছানায় শুয়ে কোথায় দু'জনে ঘুমিয়ে পড়বে—তা না, শুয়ে শুয়েই অনেকক্ষণ জেগে থাকল। শহরতলীর ঘরে ঘরে রাতের রেডিও 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা' গেয়ে গেয়ে একসময় থেমেও গেল। তখনই একটু একটু করে অনিলের স্টেশন জেগে উঠল। একদম ইণ্টারনাল সার্ভিসের প্রোগ্রাম বলা যায়। দাঁতের ফাঁকে কাঠি দিয়ে মাংসের কুচি তুলতে গিয়েই অনেক কথা বলে ফেলল অনিল।

এই যেমন—

'আমার ভেতরে এই কিছু দিনের মধ্যে কি ঘটে গেল তা তুমি জানো না নিবারণ।'

'সব জানি। আন্দাজ করেছি। বলার দরকার নেই কোন।'

'সে তুমি ভাবতে পারবে না।'

'খুব পারবো।'

'আমি তোমাকে আজ কিছুই বলতে পারব না। যদি কোনদিন পারি—', বালিশে অনিলের নাক ডেবে বসে গেল।

'পারার দরকার নেই কোন।'

'একদিন বলব তোমায়।'

'কি আর বলবে অনিলদা। ও জিনিসটা আমার কাছে কিছু বড় ব্যাপার নয়।'

'তবু আমাদের সব পাপের দাম—বেতন দিতে হয় নিবারণ।'

'ছোট বেলায় বাংলা বাইবেল পড়েছিলে! পাপ বলছ কেন? তোমার জায়গায় আমি পড়লেও ওরকমই কিছু একটা ঘটে যেত—'

'তবু আমারই তো—আমারই ছেলে।'

বেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ। কোন কথা নেই। নিবারণ সেই ফাঁকে তার সব স্নায়ু একত্র করে বার বার গুছিয়ে ভেবে দেখতে গেল—কার? কার ছেলে? ঠিক কার? সেকথা ঠিক কে জানে? মা? সন্তানের পরিচিত পিতা? ছেলের অপরিচিত বাবা?

'কোন আর যোগাযোগ নেই নিবারণ। ওরা কেমন আছে তাও জানি না।'

'ফারনেসেও যাবেন না—ল্যাবরোটারিতেও না। জানবেন কি করে!'

অনিল এবার তার মাথার বালিশকেই সব জবাবটুকু দিল। তার মুখের কথা ঘুমে চোলাই হয়ে জড়ানো অবস্থায় বালিশে গেঁথে গেল।

খানিক দূরে বোধ হয় গ্রাম আছে। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো পাখির কিচির-মিচিরে। কয়েকটা ঘুঘুর সঙ্গে একজোড়া শালিক নেমে পড়ে উঠোনের ধুলো পায়ে পায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিল। নিবারণ তখনও ঘুমে। তার ছেলে ভোর ভোর উঠে একা স্বাধীনভাবে উঠোনেরই এক কোণে প্রাণভরে খেলছে। কোনদিকে তাকাবার ফুরসৎ পাচ্ছে না একদম। অনিল দেখল, ছেলেটা একই ধাঁচে তিন তিনবার গুঁড়ো মাটি দিয়ে ঢিবিমত কি বানালো। তিনবারই নির্মমভাবে তা ডলে মুছে দিল। আবার বানাতে শুরু করেছে। শিশুরা খুব নিষ্ঠুর হয়। এভাবেই তো ফি-বর্ষায় বড় নদীতে হাওয়া উঠে নৌকোডুবি হয়। তবু ফিরে হাওয়া হয়। নৌকোও চলে।

॥ ৮ ॥

আজ লতা সাক্ষী দেবে। ঠিক দশটায় শুরু।

কিন্তু আমার বেশি করে সুশীলের কথাই মনে হচ্ছে। কাল সন্ধ্যেবেলা রেবা লোহার শিকের ওপাশে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এদিন আর কাঁদেনি। শুধু বলেছিল, 'এরকম গোঁয়ার্তুমি করে আমাদের সবাইকে পথে বসানোর কোন অধিকার নেই তোমার।' রেবার চোখে আর এবার কোন জল ছিল না। থাকলে তা ফুস্ করে ধোঁয়া হয়ে উবে যেত।

যা বলছিলাম। সুশীল। সুশীল ভদ্র।

ওর মধ্যে আমার মা আছে। একথা ও যদি কখনো শোনে বা টের পায়—তাহলে ও বিরক্ত, বিব্রত কিংবা বিমূঢ় তো নিশ্চয়ই হবে। ও হয়ত অনিলদার মতই বলবে, শোনো নিবারণ, তুমি ডাক্তার দেখাও। তোমার মধ্যে কোন বড় একটা গোলমাল আছে। তুমি ডিরেঞ্জড্।

আমার চেয়ে আজ আর বেশি কে জানে—যে, গণ্ডগোল আছে ঠিকই—কিন্তু তা তোমাদের মধ্যে। আমার নয়। আমি জানি। তোমরা এখনো টের পাওনি। জানো না। মালুম হবে পরে।

সুশীলকে আমি যেদিন ডেকেছি পেয়েছি। ডাকবার সময় ও উঠে আসতো। যেন আমার জন্যেই সব কাজ সেরে রেখে বসে ছিল। একদিন বললাম, 'চল আমরা লয়েডস্ ব্যাংক অব্দি হেঁটে যাব।' তখন সবে মেট্রো। ও দিব্যি ময়দানের গা ধরে বাদাম ভাঙতে ভাঙতে আমার সঙ্গে হাঁটলো। কত বিষয়ে আলোচনা করল। হাতে ঠাণ্ডা লাগছিল বলে আমি ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি। ডিসেমবর। রাত আটটা হবে।

সুশীল। ভাই সুশীল। আমি প্রায়ই ভাবি তুই কি দিয়ে তৈরি। তুই এক বালতি দুধ থেকে বের করে নেওয়া টাইট ছানাটুকু মাইরি। অদ্ভুত সরল, সৎ, সুন্দর, ভদ্র। আমার এক এক সময় ভয় হয়—পাছে তুই হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠিস—আর পারছি না—আর পারছি না—আমি এই ভদ্রতার ভান করে করে ভেতরে শুকিয়ে গেলাম। কিন্তু তা তুই করিসনি আজও। তার মানে তুই যা তা তুই। নাহলে এতদিনে চেঁচিয়ে উঠতিস।

মনে আছে? একদিন ফাল্গুন মাসে রাত দশটায় স্কট লেনে দেখা। তুই বললি, 'আজ রাতটা আমরা একসঙ্গে কাটাবো।'

আমি রাজি হতে তোর কত আনন্দ।

ছোট একটা রাম কিনলি ব্ল্যাকে। তারপর তোদের বাড়ির পথে যশোর রোডের ওপর দোকান খুলিয়ে বেশি রাতে কষা মাংস নিলি। তোর বৌ আমাদের দু'জনকে বারান্দায় বিছানা করে দিল। পাশের ঘরে জোড়া খাটে বেচারা শুয়ে পড়ল। আমি তোকে কতবার বললাম—'আর খাব না—এই শেষ গ্লাস। এবার তুই শুয়ে পড়গে যা।'

তুই কিছুতেই গেলি না।

লোকে বলে অশোক। লোকে বলে হর্ষবর্ধন। কথায় বলে অতিথি নারায়ণ।

তুই তাদের সবাইকে টেক্কা দিলি। শুধু আমার জন্য। উঠানের ডাগর কদম গাছ মাথা তুলে বারান্দায় কচি পাতা পাঠিয়ে দিয়েছে। সামনের খোলা আকাশে একটা চাঁদ। হাতের গ্লাসে বেদানা চটকানো দূষিত রক্ত রঙের রাম। সোডার অভাবে কেটলি থেকে জল ঢেলে দিলি। দু' সিপ নিয়ে তোর মুখে তাকালাম। তোর ফরসা আদুর গায়ের নানা দিকে মশারা বসে। ভ্রূক্ষেপ নেই তোর। যেন আমাকে খুশি করতেই তোর জন্ম, তোর জীবন। সেদিনই বুঝলাম, তুই আমাকে ভালবাসিস। আমার জন্যে রোজ ভেতরে ভেতরে মরিস। তারপর তোর নেশা ধরে এলে উঠে দাঁড়িয়ে

খুব আদর করে আমার কপালের ঘাম মুছে দিলি। উঃ! সে যে কি মেশামিশি। আমি দড়ির চারপাইয়ে একাই শুয়ে পড়লাম। তুই মেঝেতে পড়ে থাকলি। ঘুম এসে আমাদের দু'জনকে চাপা দিল।

ভোরের বাকি ছিল। চোখ খুলে দেখি, তুই অঘোরে নাক ডাকছিস। গেঞ্জি পরিনি বলে ঘামে পিঠের কাছে পাঞ্জাবি অনেকটা ফেঁসে গেছে। সেই অবস্থায় তোদের বাড়ির বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শেষরাতের ঠাণ্ডা বাতাসে চোখে আরাম পাচ্ছি। তুই বলেছিলি, 'নিট খা—মশার কামড় টের পাবি না।' শেষ দিকে তাই খেয়েছিলাম।

চোখের ওপরের পাতা ভারি। দমদম জংশনে এসে শেয়ালদার ট্রেন ধরব। শুনলাম ওই প্ল্যাটফর্মে গাড়ি আসবে। আলো জ্বলছে তখনও স্টেশনে। লাইন টপকে যেতে গেলাম। অসংখ্য লাইনের জট। একটা ইলেকট্রিক ট্রেন আসছিল। নিঃশব্দে। আমি যত এড়িয়ে যেতে চাই—ট্রেনটা ক্রমেই শুধু আমারই দিকে এগিয়ে আসছিল। বিচ্ছিরি অবস্থা। জীবন নিয়ে তো ইয়ার্কি হয় না। প্ল্যাটফর্মের লোকগুলো অবস্থাটা দেখে—আমাকেই গাল দিচ্ছে জোরে জোরে। জীবন নিয়ে আমার মায়া আছে নিশ্চয়। ঘাবড়ে গিয়েও লাষ্ট চান্স হিসেবে একটা লাফ দিলাম। দেড় হাত দূর দিয়ে ট্রেনটা বেরিয়ে গিয়ে থামল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে নেমে আসছিল। বুঝলাম গালাগালি সহযোগে লাথি দিতে পারে। লাফ দিয়ে বেশ ব্যথা পেয়েছি। চারদিকে ইস্পাতের ছড়াছড়ি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠলাম—তারপর অন্যমনস্ক প্যাসেঞ্জারের ভান করে অনেক কষ্টে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সেদিনই বুঝলাম—আমি তোকে ভালবাসি। তুই আমাকে ভালবাসিস।

চাঁদ ঢলে গেলে তুই গাইছিলি।

এসেছে বিপিন সুধা
বাজে ওষুধ আর খাব না॥

আমি শুনলাম—

Sএচে Bpin Shoeদা

বাজে Oshocদ R কাবো না—

কি গলা। খুব চেপে গাইছিলি। গলায় তোর খাপে খাপে আনকোরা সিরিশ কাগজ বসানো। ভেতরের টাটকা তাজা প্রাণ থেকে উঠে এসে সব আওয়াজটুকু ঝনঝন করে বাজছে। আমাদের দু'জনেরই কপালে চুল পড়ে চাঁদের আলোয় খানিক ছায়া হয়েছে। তখনই জানলাম—আমরাও তো এই পৃথিবীতে নতুনই এসেছিলাম। এসব ভাবতে পরে লজ্জা করে। কেননা, তখন মনে হবেই—আমরা কে বা কোথাকার হরিদাস পাল।

পায়ে ব্যথা, গায়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবী, চোখ মুখ ফুলো ফুলো। এই অবস্থায় নিবারণকে দেখে রেবা সকালবেলার রোদ্দুরে মোজাইক মেঝেতে এমন করে দাঁড়ালো—যেন ও কোন মূর্তি। নিখুঁত নাক মুখ চোখ—কিন্তু খুব কঠিন। র‍্যাদা চালিয়েও ভাঙা যাবে না।

'কাল বাড়ি ফিরলে না কেন?'

নিবারণ চুপচাপ গায়ের জামা খুলতে গিয়ে একদম ছিঁড়ে ফেলল। কোথায় এখন নুন মাখানো লেবু চুষে হালকা হবে—গা গুলোনো ভাবটা কাটিয়ে উঠবে। তা না। কৈফিয়ৎ কর—কোথায় ছিলে? কার সঙ্গে ছিলে?

'মেশামিশি করতে গিয়েছিলে?'

নিবারণ চোখ তুলে তাকালো। সেই চোখেই রেবা আরেকটা কথা ছুঁড়ে মারলো,

'কি! ফ্রেণ্ডশিপ করতে হল সারারাত!'

এ কি বস্তুরে বাবা! নিবারণের মুখ দিয়ে ফট করে বেরিয়ে গেল, 'লাইফ তো একখানাই। একশো টাকার বড় নোট। একবারই ভাঙাবো।'

হাততালি দিয়ে উঠলো রেবা, 'এনকোর! এনকোর!!' তারপর

থেমে আরও কঠিন করে তাকিয়ে বলল, 'পালা লিখছো বুঝি আজকাল!'

নিবারণ চারিদিক তাকিয়ে হঠাৎ সিওর হয়ে গেল, ভুল করে অন্য কারও বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। এখানে তার আসার কথা নয়। এই মেয়েলোকটি কোন পয়সাঅলা লোকের বউ বা কেপ্ট। বিছানায় এত বেলা অবধি যে ফুট ফুটে ছেলেটা ঘুমোচ্ছে—ও কোন সুখী দম্পতির পারফেক্ট বাচ্চা। এই যে সাজানো ঘর—এত সুন্দর সব নতুন নতুন ফার্নিচার—এসব পাশেরই কোন পড়শীর।

নিবারণ যেমন এসেছিল—তেমন বেরিয়ে যাচ্ছিল।

'দাঁড়াও।'

'আমি চলে যাচ্ছি।'

'শোন। আমাদের কি হবে?'

'আমি তোমাদের কেউ না।'

'আমরা কাদের?'

'অন্য কারো।'

'ইয়ারকি রাখো। আমাদের দেখবে কে?'

'নিজেরাই পারবে।'

নিবারণ বেরিয়ে পড়েছিল। রেবা এগিয়ে এসে বলল, 'এমন ছেঁড়া জামা পরে ঘুরবে?'

'আমার আজকাল এসবে কিছু আসে যায় না। আমার সামনে কিছু নেই—পেছনেও কিছু নেই।' আর বলতে পারল না নিবারণ। যা বলতে চেয়েছিল—তা হল—আমি এখন একটা শাদা পর্দার দিকে হেঁটে যাচ্ছি। কোন চার্ম নেই। কোন রং নেই রেবা।

কাল জেলখানায় গরাদের ওপাশে দাঁড়ানো রেবাকে সেকথাই বলতে চেয়েছিলাম আমি।

রেবা তুমি এখন যতই কাঁদো—আমার আর কিছুই করার নেই। তুমি চিরকাল ব্যক্তিত্ব চর্চা করেই গেলে। সময় মত একটু ঝুঁকে

যদি আমার সঙ্গে মিশে যেতে তাহলে কি আর আমাকে এসব গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়তে হত। তুমি মিশলেই না আমার সঙ্গে। রোজ সন্ধ্যেবেলা কলকাতায় যেসব মেয়েলোক অফিস ফেরৎ স্বামীর জন্যে খোঁপা বাঁধে, চুল না ভিজিয়ে গা ধোয়—তুমি তাদের থেকে আলাদা হলে না কেন? তখন কতবার বলেছি—রেবা তুমি বদলাও, তুমি অন্যরকম হও।

কিন্তু গা করোনি। ভেবেছ এসব ছেলেদের একটা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

একদিন লতারা প্রেসার কুকার নিয়ে রেঁধে খেয়ে বেড়িয়ে গেল। মাখন বাজার করল।

দুপুরে জল এল না। কোথায় পাম্পিং স্টেশনে গণ্ডগোল। লতা ছেলেমেয়ে নিয়ে পাশের রং কোম্পানির পুকুরে নামল। রবিবার কোম্পানীর অফিস বন্ধ। দারোয়ান নানা প্রকারে সাহায্যও করল। অতিথি বলে নিবারণকেও সেই পুকুরে গামছা কাঁধে যেতে হল।

লতার পাশাপাশি গলা জলে দাঁড়িয়ে নিবারণ প্রথমেই বলল, 'অনিলদার সঙ্গে দেখা হয় না কদ্দিন?'

লতার ছোট বাচ্চাটা ঘাটের ধাপে বসে মগ ডুবিয়ে জল ঢালছিল মাথায়।

'কি হবে দেখা হয়ে।'

'তোমাকে কিন্তু ভালবাসে। মনে হয়—এখনও কষ্ট পায়।'

'কতলোক তো কষ্ট পায়। তাতে কি হয়!' একটা কুলকুচি করল লতা।

আজকাল খুব বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন সায়ান্স কলেজে কারবন স্ট্রাকচারের ওপর সেমিনারে ঝাড়া তিরিশ মিনিট বলল।'

'একটু বেশি কচকচি আছে লোকটার।'

এবার আর সামলাতে পারল না নিবারণ, 'তুমিই তো আগে

বাধানো খাতায় সেমিনারে সেমিনারে ওর পেপার্সের নোট নিতে—কত ভক্তি—কত ভাব ভালবাসা তখন!'

'সে নিয়েছি। নিয়েছি!'

'তবে তাহলে মিথ্যে মিথ্যে নোট নিতে—আরও কি সব করতে—'

'কি করতাম?'

'নাঃ! থাকগে। বলব না।'

'বলই না শুনি।'

'হঠাৎ গলা খোলা ব্লাউজ, হাইহিল, রঙীন ডুমো পাথরের মালা গলায়—'

'কি সর্বনাশ! সব চোখে পড়েছে! তা তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে কেন?'

'একজন জানাশুনো মেয়েছেলের পূর্বরাগ। অভিসার হচ্ছে চোখের সামনে—দেখব না?'

'বুক পুড়ে যেত বুঝি!'

'বিশ বছর আগে হলে যেত।'

তারপর নিবারণ জলের মধ্যে দিয়ে লতার কোমরে হাত রাখলো, 'কেমন লাগছে?'

'কিচ্ছু হয় না। এখন আর আমারও কিছু হয় না নিবারণ।'

'তাহলে দেখ কত সুবিধে। আমরা যদি মিশেও যাই—কোন ভয় থাকবে না। দিব্যি ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসব।'

লতা জলের ভেতরেই নিবারণের একটা জায়গা ধরে বলল, 'একেবারে গায়ে গায়ে লেগে থাকতে বুঝি বড্ড ভাল লাগে?'

'তা লাগে,' বলে নিবারণ জলের ভেতরেই যতটা পারা যায় ছুঁতে গেল লতাকে। ছোঁয়া গেল না। লতা সরে গেছে। দু'ধাপ ওপরে উঠে ভারি দুই হাঁটুর ওপর ভিজে শাড়িটা টিপতে টিপতে বলল, 'ওই অনিল ফনিল ভীষণ হার্টলেস ক্রিয়েচার।'

রেবা গন্ধ তেলের শিশি হাতে এসে দাঁড়ানোয় আর কথা বলা গেল না।

ঠিক দশটায় লতা হলফনামা পড়ে কাঠগড়ায় সিধে হয়ে দাঁড়াল।

'অনিল দত্তকে আপনি কতদিন চেনেন?'

'৩।৪ বছর।'

'তিনি মানুষ কেমন ছিলেন?'

লতা ফট করে নিবারণের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'খুব ভালো।'

'কিরকম?'

'ভালো লোক যেমন হয়।'

'তবু—'

'বললাম তো।' তারপর একরকম নিজে থেকেই বলল, 'ওপর-অলা যেমন হয়। বরং তার চেয়েও ভাল। অধস্তনদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক ছিলেন—'

'আপনার প্রতি সিমপ্যাথেটিক ছিলেন নিশ্চয়।'

'তা ছিলেন বইকি।' আচমকা থেমে গিয়ে লতা চেঁচিয়ে উঠল, 'আই অবজেক্ট।' তারপর নিজের সঙ্গেই যেন তর্ক করতে করতে বলে উঠল, 'কেউ যদি ভদ্র ব্যবহার করেন, কাইণ্ড হন—তাতে ইংগিত করার কি আছে?'

নিবারণ উল্টো দিকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মনে মনে বলল—মিথ্যুক।

ভিড়ের মধ্যে রেবা ঠোঁট কামড়ে বসে আছে।

'নিবারণ পাকড়াশিকে কতদিন চেনেন?'

'তা প্রায় বিশ বছর।'

'লোক কেমন?'

'খুব ভাল।'

'আপনি বিশ্বাস করেন—নিবারণ পাকড়াশি অনিল দত্তকে খুন করেছে?'

'আমার তো বিশ্বাস হয় না। নিবারণকে যতদূর জানি—ও বড় দুঃখী।'

রেবা সোজা হয়ে বসল।

'ভালো চাকরি, বিবাহিত, নিজের বাড়ি হয়েছে—তবু নিবারণ বাবু দুঃখী?'

লতা একটু হাসলো, 'সে আপনি বুঝবেন না।'

'বলুন না একটু—সে কেমন দুঃখ।'

লতাকে মনে হল কোন বড় মাঠের ভেতর বড় গাছতলায় দাঁড়িয়ে ফ্রি ভার্সে কথা বলছে, 'নিবারণের তো কোন বন্ধু নেই। ও তো সারাজীবন এ টেবিল সে-টেবিলে বন্ধু খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে—কোথাও ওর হয় না—'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'বাঃ! আমার বিশ বছরের বন্ধু—আমি জানবো না?'

নিবারণ এবার চুপ করে থাকতে পারল না, 'আমার কোন বন্ধু নেই। আমি কারও বন্ধু নই। হুজুর আজ অব্দি জীবনে কারও সঙ্গে আমার প্রাইভেট টক হয়নি—সাইড টক হয়নি। আমি যেদিন থেকে আত্মার দিকে এগোচ্ছি—,'ঝপ করে থেমে গেল নিবারণ।

'বলে যান।'

'আমার আর কিছু বলার ইচ্ছে নেই।'

লতা থাকতে পারল না। ওর ভেতর থেকে কনডেন্সড্ মিল্কের চেয়েও গাঢ় জমানো কান্না বেরিয়ে পড়ল, 'নিবারণ তুমি আমাদের মধ্যে ফিরে এস আবার। কেন এই বেয়াড়াপনা করে যাচ্ছ। তুমি তো কাউকে কোনদিন খুন করার লোক নও।' আর যা বলতে পারল না লতা, তা হল: আমি মেয়েছেলে।

আমাদের পুরুষমানুষের সঙ্গে অমন এক আধবার হয়। আমরা ঘাটের জল। ফিরে ফিরে বদল হয়ে আসি। তুমি কেন অনিল দত্তের জন্যে বরবাদ হবে। টেক ইট ইজি।

বাচাল আদালত ঘর স্তব্ধ হয়ে গেছে। শশধর সান্যালের চোখে পলক পড়ছে না। পেশকার বাবু হুজুর বরাবরে কি সব কাগজপত্র এগিয়ে দিল।

'হ্যাঁ। আমিই খুন করেছি।'

কথায় কত গাম্ভীর্য। ঘর সুদ্ধ লোক চুপ।

হাকিম পরিষ্কার বাংলায় জানতে চাইল, 'কেন খুন করলেন?'

'উপায় ছিল না হুজুর।'

'কিসের?'

'আমি যে অনিলের আত্মার হদিশ পেয়ে গেছি স্যার। পরিষ্কার দেখতাম ওর বুক ফুটো হয়ে নীলচে আলো উথলে পড়ছে। তাছাড়া—'

আর এগোতে পারল না নিবারণ। তার মধ্যেই আদালত হো হো হাসিতে ফেটে পড়েছে। সরকারী উকিল কিছু হারিয়ে খুঁজে পাচ্ছে না, এভাবে হাতড়াচ্ছে। শশধর যা চেয়েছিল তাই হল। হাকিম দু'বার হাতুড়ি ঠুকতেই সব শান্ত।

নিবারণ আপনাআপনি বলল, 'আমাদের মেশামিশির পথে যা কিছু বাধা—তা এই হুজুর—', বলে নিজের বুকে হাত রাখল, 'এই জায়গা হুজুর। কেউ জানে না, আমি জানি।'

এবার হুজুরের হাতুড়ি গোলমাল থামাতে পারল না। লতা কাঠগড়া থেকে নেমে অবাক চোখে নিবারণকে দেখছিল। রেবাও তাই।

এত কাণ্ডকারখানার মাঝে দু'টি লোক খুব সন্তুষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিল।

একজন শশধর সান্যাল। কত মাথা খাটিয়ে কত যুক্তি সাজিয়ে

নিবারণকে বাঁচানোর জন্য সতের পৃষ্ঠা সওয়াল টাইপ করিয়েছে তার আর দরকার হবে না। নিবারণ নিজেই প্রমাণ করেছে, সে একজন অপ্রকৃতিস্থ লোক। অন্তত হাকিম কনভিন্সড্।

অন্যজন নিবারণ পাকড়াশি।

সে এখন খুব পরিচিত একটি পথের ভিতর দিয়া আগাইতেছিল চলাফেরা উৎফুল্ল। পাশে তার অনিলদা। দামী ধুতি পাঞ্জাবী পায়ে পাম্পসু। দু'জনে মনের কথা বলিতে বলিতে একটি সেতু পার হইল। সামনেই একটি ধূসর প্রান্তর। তাহার আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। একজন আদিবাসী শিকারী ধনুক কাঁধে দূরে বানবি ঘুঘুটাকে ধরিতে ছুটিল। দু'জনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল দিগন্ত পার হইয়া যাওয়া শিকারী তখনও কোন পাখী পায় নাই।

'তোর হাতে আমার মরার কথা ছিল না নিবারণ।'

'আমিও ভাবিনি অনিলদা।'

বলিতে বলিতে দু'জনেই একটি বিরাট তুতে গাছের ছায়া বসিয়া পড়িল। গাছটি ছায়া এবং আশ্রয় দুইই দিয়াছে। এ পাশ দিয়া একটি জীর্ণ দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ খানিক দূর প্রসারি হইয়া আপনাআপনি নানান গুল্মলতায় ঢাকা পড়িয়া হারাই গিয়াছে।

সেদিকে তাকাইয়া অনিলের মনে হইল, এই পত্র স্পন্দন, এ ছায়াচ্ছন্ন নিবিড়তার—ইহার মধ্যে সে খুব মূল্যবান একটি চা খোয়াইয়া বসিয়া আছে। এই চাবি থাকিলে মৃত অনিল দত্ত আজ এখনই নিবারণের হাত ধরিয়া পরিচিত লোকালয়ে চলি যাইত।

নিবারণ তখন বুঝিয়াছে—সে অনিলদার সুখসঙ্গে ডুবি যাইতেছে। তাহার হাতে এমন কোন পরিচয় পত্র নাই—যাহা দি ভাগ্যক্রমে ফিরিয়া পাওয়া অনিলদা ও তাহার জগতে পাকাপা যাওয়া যায় এবং থাকিয়া যাওয়া যায়।

হারাইবার ভয়ে নিবারণ পাকড়াশি অনিল দত্তর হাতখানি ভাল করিয়া ধরিল।

বাতাসে সুগন্ধ। বোঝা যায় না কোথা হইতে আসিতেছে।

বোঝা যায় না—এখন সে স্মৃতি না স্বপ্নে আছে।

সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে নিবারণ টের পাইল—একে একে সবাই ভাসিয়া উঠিতেছে। প্রথমেই রেবা, তারপর শশধর—ক্রমে ক্রমে লতা ও হাকিমও তাহার চোখের সামনে দেখা দিল।

৯

এভাবেই হোটেল ঘরে অনিলদা একদা নিবারণ পাকড়াশির চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। ডানলপের গদিতে—আঠাশ নম্বর ঘরে রাত তিনটেয় নিবারণের ঘুম ভেঙে যায়। সাতাশে আগষ্ট। রাত তিনটে। কি একটা বনধ্ ছিল চব্বিশ ঘণ্টার। কিন্তু ফারনেস তো বন্ধ রাখা যায় না। একবার নিভলে ফিরে জ্বালাতে গেলে আবার মাস খানেকের ধাক্কা। তাই ষ্টিল উইজার্ড অনিল দত্তকে কোম্পানি হোটেল ভাড়া করে সেণ্ট্রাল জায়গায় রেখেছিল। দরকার মত ফোন করে ফারনেস থেকেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মেল্টাররা অনিল দত্তর নির্দেশ পাবে। ফারনেস রুফে সিলিকা যদি গলে পড়তে শুরু করে তবে সাতজনের একটা দলকে অন্তত চল্লিশ মিনিট ধরে অ্যালুমিনিয়ম্ অকসাইড্ তথা ডলোমাইটের গুঁড়ো বেলচায় করে তাক মত উইক জায়গায় ছুঁড়ে মেরে পুলটিশ লাগাতে হবে। এরকমের হাজারো প্রবলেম দেখা দিতে পারে বলে অনিলকে ফোনের আওতায় রাখা হয়েছিল। কেননা, ডালহৌসি পাড়ার হোটেলের ফোনের লাইন আর যাই হোক বনধ্ হলেও কাটা যাবে না—মানে, সাধারণত কাটা পড়ে না।

সন্ধ্যের ঝোঁকে নিবারণকে তুলে নিয়েছিল অনিল—নিজের গাড়িতে। বাড়ি ফিরতে দেয়নি। ডবল বেডের ঘর। এয়ারকুলার বসানো। ড্রেসিং টেবিলের সামনে অনিলের পাজামা ঝুলছে। বোঝাই যায়—অনিল সকাল থেকেই এখানে আছে।

'তোমাকে আজ আমার একটা পেপারের খানিকটা শোনাব।'

'বেশ তো—'

'আয়রণ ওর পৃথিবীর ভেতর থেকে তুলে এনে আমরা সদ্ব্যবহার করছি কি? মোটেই না।'

'কোনটার সদ্ব্যবহার হচ্ছে বলুন তো ?'

অনিল মুখ তুলে তাকালো।

নিবারণ ফিরে বলল, 'আমরা এই যে বারবার মরে গিয়ে—শ্মশানে ছাই হয়ে আবার কোটি কোটি মানুষ হয়ে ফিরে আসছি—এর হিসেব রাখে কে ? এর কতটাই বা ঠিক ঠিক ইউজ হচ্ছে—'

অনিল মুখে বলল, 'তা বটে !' তারপর কি ভেবে খুব ঘাড় কাৎ করে বলল, 'নিবারণ আজ তোকে গাইতে হবে—হবেই—'

'বাঃ ! আমি কি গান জানি।'

'যা জানিস তাই গাইবি ! কোন একস্‌কিউজ শুনবো না—'

নিবারণের শেখা শুনে শুনে। দু' একটা রাগের নাম জানে। গানে যেখানে ঝোঁক থাকে সেখানে তার গলা অন্ধকার মেঘ করে নেমে আসে। তাই অনেকের ভাল লাগে। নাহলে এমন কিছু ভাল নয়।

ব্রাণ্ডির আধখানা বোতল বিছানার ওপর কাৎ হয়ে পড়েছিল। অনিল দু'টো গ্লাসে বড় করে ঢেলে দিল। নিজেরটায় ঠাণ্ডা সোডা দিয়ে নিবারণের গ্লাসে শুধু জল মিশিয়ে দিল, 'গাইয়ে লোকের গলায় এত ঠাণ্ডা সোডা লেগে যাবে—'

নিবারণ ধীরে ধীরেই খায়। কিন্তু অনিল ঢক্ ঢক্ করে মেরে দিয়ে খালি গ্লাসটা ঠক্ করে নামাল, 'তোর হয়নি। মেরে দে। কুইক্ কিক্ হবে—'

অগত্যা—

অল্প সময়ের ভেতর নিবারণের ঠোঁটের ঠিক নীচেই গালের নৈঋৎ কোণে—তাছাড়া ওটা কোন্ অ্যাঙ্গেল আর হবে !—মাংস আপনা আপনি কুচকে উঠেই ঢিলে হয়ে যেতে লাগল। অর্থাৎ নেশা হলে গোলাপি আমেজে যে আরামটুকু সারা শরীর দখল করে নেয়—তাই হতে লাগল।

'এখন আমার·····ঝুলেছে
কপাল পুড়েছে
পান্তা ভাতে নুন জোটে না—'

ঘুরিয়ে গাইতেই অনিল 'আহা! আহা!' করে উঠল।

ওয়েটার খাবার সাজিয়ে দিচ্ছিল। আরও একটা ব্রাণ্ডি এল—সোডা। লোকটা চলে যেতেই গান জমে উঠল। আবার গ্লাস হলদে হল। আবার হল। গানে নিবারণের বুক খুলে যেতে লাগল। অন্য জায়গা থেকে ধরল: আস্তে আস্তে খাওগো চুমু—যেন আমার নথ ভাঙে না—'

তখন নিবারণের নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাসের হল্কা বেরোচ্ছিল। নিবারণ দেখতে পেল, অনিলের গায়ে নেটের গেঞ্জির ফুটো দিয়ে নীলচে আলো বেরিয়ে পড়েছে। এ তো লুকোনো যায় না। লুকোনোর নয়। যার বেরোবে সে নির্ঘাৎ খাতায় উঠে যাবে। ভালবাসাবাসির খাতায়। মেশামিশির খাতায়। নিবারণের পুচ্ করে হাসি বেরিয়ে গেল। মনে মনে বলল, অনিলদা তুমি আজ থেকে ভালবাসাবাসির জিনিস—ভালবাসাবাসির জন্য প্রদত্ত হয়ে গেলে। তুমি কত ভাগ্যবান।

জামা কাপড় খুলে শুধু আণ্ডারঅয়ার পরে বসল অনিল, 'নে গা—'

'বাবু মনে মনে ভাব
তোমার মত বাবু নাই
মিছে কোরো না কোরো না বড়াই
তোমার মত কেহ নাই
কষ্ট করে যত্ন কর এদেহ
আতর গোলাপ
সাবান খরচ প্রত্যহ'

অনিল গান শেষ করতে দিল না, 'তুই কি রে নিবারণ—'

তারপর দু'হাতে নিবারণকে এলো পাথাড়ি চড় মারতে লাগল অনিল, 'ভীষণ আনন্দ হচ্ছে নিবারণ! ভীষণ দুঃখ হচ্ছে নিবারণ! আর খানিকটা পাউডার মাখবি।' বড় একটা কৌটোর প্রায় আধখানা ঢেলে ফেলল অনিল। নিবারণের কাঁচা চুলে পড়ে তাকে আধবুড়ো দেখাতে লাগল। অনিল তখন নিজেই গাইছে—'সাবান খরচ প্রত্যহ—'

বাইরে যারা দেশটা বনধ্ বলে যে যার ঘরে আলো জ্বালিয়ে, আলো নিভিয়ে সুবিধা মত নিত্যকর্ম করছিল। কলকাতার ফাঁকা রাস্তা দিয়ে পুলিশের গাড়ি হুইসেলের মত হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। টানা রিক্সাগুলো মোড়ে মোড়ে মাথা নীচু করে জমে আছে। পানের দোকানে পান ও ক্যাপ বিক্রি হচ্ছিল। 'যেন আমার নথ ভাঙে না'—ঘুরিয়ে গেয়ে অনিল বলল, 'চান করে আসি চল—'

'আপনি আগে যান।'

অনিল বেরিয়ে আসতেই নিবারণ ঢুকলো।

খানিক পরে গভীর রাতে রেড্ রোডে একটা কালো অ্যামবাসাডর বেরোলো। দিনের বেলা হলে নির্ঘাৎ অ্যাকসিডেন্ট্ হত। ফাঁকা রাস্তায় একাকী মোটর এলে বেলে প্যাটার্নে এগোচ্ছিল। স্টিয়ারিংয়ে ভিজে আণ্ডার-অয়ার পরে অনিল। পাশে খালি গায়ে নিবারণ। খিদিরপুর ব্রিজ পেরোতেই নামকরা বড় রেস্তোরার বন্ধ দরজায় হেডলাইটের আলো পড়ল। অনিল বলল 'এখানেই প্রথম লতাকে চুমু খাই—'

'মেমোরেবল্ প্লেস্—!'

'সে তুমি যাই বল—,' তারপর হেসে মুখ নীচু করে অনিল বলল, 'নথ ভেঙেছিল!'

'একখানা কালো পাথর এনে এখানে বসিয়ে দিলে কেমন হয়—'

অনিলের গাড়ি অনেকটা এগিয়ে গেছে। দূরে ডকের ভেতর

সারি সারি জাহাজ আলোয় আলো হয়ে আছে। কে কোথায় একটা বিদেশী বাজনা বাজাচ্ছে।

নিবারণ বলল, 'সেই পাথরে লিখে দেব—ডেথ্ অব এ কিস্—'

আচমকা ব্রেক কসলো অনিল। দাঁড়ানো গাড়িতে বসে নিবারণের দিকে ফিরে তাকাল, 'অন্যের কসটে দেদার হেসে নিচ্ছিস! তাই তো—'

'কসট্ বলছ কেন? বল কষ্ট!'

'পরের অ্যাকাউনটে তুই চিরকাল হাসবি আমি জানি। তুই যে এখনকার লোক!' তারপর কি মনে পড়তে ঠেলে উঠল, 'একদিন আমার বুকে হেলান দিয়ে মাঠের মধ্যে বসে বলেছিল—ওগো নিবারণ শুধু আমার শরীর দেখে—'

কবে লতার শরীর দেখেছে নিবারণ মনে করতে পারল না। তবে হ্যাঁ। যুবতী নারী। গরুটাও সামনে দিয়ে গেলে ওলান, লেজ চোখে পড়বেই। মাঝে মধ্যে তলপেট, পাছা, বুক, ঠোঁটে চোখ কি পড়েনি? মালগাড়ির ইঞ্জিন পাস করলেও নিবারণ্ তার ধোঁয়া দেখে থাকে। তবে হ্যাঁ—আই নিবারণ পাকড়াশি ডু হিয়ারবাই সোলেমলি ডিক্লেয়ার দ্যাট্—লতা আমি তোমার ব্লাউজ জুড়ে কোনরকম নীলচে আলো বেরোতে দেখিনি। আমি যা দেখেছি, তা হল, তুমি খুব ঘন করে অনিলদাকে কাছে টানছো। অনিলদা ঘেমে যাচ্ছিল—তাও তুমি কাছে টানছিলে। সেজন্যেই বোধ হয়—নিজেকে আরও মনোহারি করে তুলতে তুমিই বানিয়ে বলেছ—নিবারণ তোমার শরীর দেখে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

'মাখন, আমি, লতা—আমরা বিশ বছরের বন্ধু অনিলদা—'

'বন্ধু টন্ধু বাজে কথা! আজ বিশ বছর তুই ছোক ছোক করিস—'

'বারে—এছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না?'

আচমকাই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে অনিল দত্ত বলল, 'আবার কি!'

অনিলের অস্বস্তি লাগছিল। এখন গাড়ি অচেনা রাস্তা দিয়ে অচেনা অন্ধকারে চলে যাচ্ছিল। দু'ধারে সারি সারি টিনের গোডাউন। মোড়ে মোড়ে বিরাট হোর্ডিং টাঙানো। তারও পেছনে দূরে, দিগন্তে খানিক জায়গায় অনেকগুলো ক্রেন শুঁড় তুলে আছে। একখানা জাহাজে ভোঁ দিল। অনিল দত্ত নিজেই বলল, 'আর তো চিনতে পারছি না—'

নিবারণের তখনো খুব ডিফিটেড্ লাগছিল। সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে। লতা নিজেকে আরও ইণ্টারেস্টিং আরও সেকসি করে তুলতেই এসব কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। লতা তার উপযুক্ত কাজই করেছে।

গাড়ি ঘচ করে থেমে গেল। অনিল স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে ঘুমোতে চাইল।

'আমি অনিলদা মেয়েছেলের জন্যে আর টান বোধ করি না—'

'অবসিন! মেয়েছেলে আবার কি?'

'মেয়েছেলে—মেয়েলোক—সব আমার সমান লাগে—সব গুলিয়ে যায়।' কি ভেবে নিল নিবারণ—যেন মনে পড়ে গেল নিবারণের, 'রেবা, হাওড়া ষ্টেশনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের ছোবড়া বেরোনো গদি, লতার তলপেট কিংবা হাসপাতালের মরচে ধরা লোহার খাট—সবই সমান লাগে আমার—'

ফট্ করে দরজা খুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল অনিল। শুকনো জায়গা। লরি দাঁড়ানোর মোটা দাগে মাটি বসে গেছে। মাঝরাতের পাতলা, ঠাণ্ডা হাওয়া কপালে লেগে পেটের ভেতরের ব্রাণ্ডি আগুন হয়ে গেল, 'সবই তোর কাছে গদি তাই না!'

নিবারণও নেমে পড়ল। আশ-পাশের এলাকায় অনেক আলো জ্বলছে। তাতেই অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। এখন তার মাথার চুলগুলো কেউ মুঠো মুঠো করে টেনে দিলে রিলিফ হত। সারা গা চন চন করে উঠল নিবারণের, 'তুই বুঝি সব বুঝিস অনিল—'

অনিল দত্ত অবাক হল। তার ভালও লাগল। কতদিন তাকে কেউ আর তুই তোকারি করে না। উপরন্তু অন্ধকারে এমন মাঠে এখন বার বারই মনে হচ্ছে—অনিল ইচ্ছে করলেই একটু চাপ দিয়ে লাফ দিলে অনায়াসে আকাশে খানিকক্ষণ উড়তে পারবে। পায়ের ধাক্কায় জল সরিয়ে দিঘিতে লোকে সাঁতরায়। এখানেও যেন অনেকটা তাই। হাতে পায়ে বাতাস দাপিয়ে এগিয়ে যাওয়া শুধু। উঃ! এতদিন তার নিজের এই ক্ষমতা তো একটুও জানা ছিল না। চাইলেই এখন সে ডকে দাঁড়ানো ওই জাহাজটার মাস্তুলের কাছাকাছি উড়ে উড়ে গিয়ে হাজির হতে পারে—চাই কি আরও উঁচু দিয়ে আরও দূরে উড়ে চলে যেতে পারে। কত মুক্ত—কত স্বাধীন এখন।

নিবারণ অন্য মুডে ছিল। তার কাছে এখন একটাই লক্ষ্য। ডান হাতের ঘুসিটা পাথর হয়ে আছে। সারা শরীরের ওজন দিয়ে অনিলের তলপেটে ঘুসি বসাল নিবারণ। প্রথমে একটা—তারপর ঘন ঘন তিনটে।

অনিল পড়তে পড়তে গাড়ির বনেটে হেলে গেল। দম বন্ধ করে সামলে উঠে দাঁড়াল, 'তুই শেষে আমার গায়ে হাত দিলি নিবারণ—,'অনিল গোড়ায় ভেবেছিল এটা বুঝি একটা খেলা। কিন্তু খেলা নয় বোঝা যাচ্ছে। আশেপাশে লোক নেই কোন। ফিনফিনে বাতাসে নিবারণ আরেকটা ঘুসি নিয়ে এগিয়ে আসছিল। অনেক আগেই হাত দু'খানা এগিয়ে দিয়ে নিবারণের কাঁধে আটকে দিয়ে অনিল তাকে থামাল, 'কি হল তোর?'

'দুনিয়ার সব মেয়েছেলে তোর?'

'বল মেয়েলোক!'

'ও জিনিস ছাড়া তুই কিছু বুঝিস না অনিল—,'নিবারণ হাঁফাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়তে চাইল, পারল না, কাৎ হয়ে গাড়িতেই গা রাখল আর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ঘুসি বসাল। অনিল মাথা তুলতে যাচ্ছিল। অচমকা বোধহয় নাকেই লাগল, হাত দিয়ে দেখল ভিজে

—রক্ত কি না কে জানে, এখান থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই, 'আমাকে মেরে তোর কি লাভ হচ্ছে বলতো—'

তা ঠিক—খানিক নরম মাংস—মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বুকের হাড়, কপালের চাকতি—কণ্ঠমণিতে এবড়ো-খেবড়ো দাড়ি—কি লাভ!

'অনিলদা—মেয়েছেলে—হলবোঝাই লোকের হাততালি—পাখির মাংস—বাইরোডে টানা গাজিয়াবাদ অব্দি দৌড়োনোর চেয়েও অনেক সুন্দর জিনিস আছে দুনিয়ায়। বিশ্বাস কর আমি দেখতে পাই। মনে করে রাখতে পারি না—ভুলে যাই। আছে কিন্তু। আছে আমি জানি। তোমাকেই আমার সুন্দর লাগে। কাল বৃষ্টিভেজা একটা ভিখিরি কাথা-কম্বল সুদ্ধ উদাস চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজভবন দেখছিল এসপ্ল্যানেডে—তার গা ঘেষে কতগাড়ি মোড় নিয়েই ছুটে যাচ্ছে—বিশ্বাস কর সব মিলিয়ে ভিখারি সম্রাট হয়ে উঠেছিল।'

অনিল দত্ত নাকের রক্ত মুছতে গেল। বুকে কোন জামা নেই। নিবারণের ট্রাউজার ভারি উরুতে চামড়া হয়ে লেপটে আছে। অনিলের চওড়া বুকে দুই থাবা মাংস। সেখানে আচমকা নিবারণ দু'খানা হাত রাখল, 'এবারে তোমার বুক খুলে ফেলব অনিলদা।' সত্যিই কোন বন্ধ কৌটো কিংবা দরজা খুলছে—এভাবেই নিবারণ বুক খুলতে লাগল। অনিল শুধু দু'একবার উঃ! আঃ! বলে চেঁচাল। কেন না, বুকের লোম ডলে যেতেই ব্যথা লাগছিল। বাকি সময়টা অনিলও হাসছিল। এ একটা খেলা বটে।

'তোমার বুকে প্রায়ই নীল আভা দেয়—'

'তুই দেখতে পাস?'

'গেঞ্জি ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসে—'

নিবারণ কিন্তু বুকের দরজা খুঁজে পাচ্ছিল না। দু'হাত দিয়ে অনিলের বুকের মাঝখানে মুখসুদ্ধ ঝুঁকে পড়ে একটা হারানো খিলান গাঁথুনির সরু রেখা খুঁজে বেড়াতে লাগল। শ্যাওলায়, আগাছায়

বুকের দুই কপাটের জোড় ঢাকা পড়ে আছে। কিন্তু নিবারণ স্পষ্ট জানে—এখানেই ভালবাসা—এখানেই মেশামিশি।

অনিল ঠিক সেই সময় একখানা ভাঙ্গা গলা দিয়ে কোনরকমে গাইতে গেল, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই-ই-ই—চিরদিন কেন পাই-ই না—'

ঠাণ্ডা বাতাসে, অন্ধকারে, দূরে জাহাজের আলোয় 'কেন পাই-ই-ই না—'দিব্যি মিশে গেল। কিন্তু ভাগ্য ভাল ছিল না। কলকাতা ওয়াচ করে পুলিশের একখানা কালো ভ্যান ফিরছিল—হেডলাইটে ওদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল। বিশেষ কথা বলতে দিল না। ছোকরা অফিসার অ্যাসকণ্টের রাস্তায় বুটের হিলে খট্ খট্ করে দিব্যি যেন ফক্সট্রটের আনকোরা গৎ তুলে যাচ্ছিল।

একবার জানতে চাইল, 'এখানে কি করছিলেন?'

নিবারণের চোখ হেডলাইটে ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল, তবু মাথা ঠাণ্ডা করে বলল, 'আমরা ভালবাসছিলাম—'

ছোকরা অফিসার খুব আস্তে জানতে চাইল, 'আপনাদের জামা-কাপড় কোথায়?'

অনিল হাসতে হাসতে বলল, 'জানি না।'

'আপনার নাকে রক্ত কেন?'

'ওকে জিগগেস করুন—'

নিবারণ বলল, 'একটু ওয়েট করুন। একটা শাবল-টাবল কিছু দিতে পারেন? আপনার সামনেই অনিলদার বুক খুঁড়ে আমি নীল আলো করে দেব চারদিকে—এক মিনিটও লাগবে না—'

'বেহেড্' বলেই অফিসার আয়ারলেস ভ্যানে গিয়ে বসল। দু'জন জাদরেল হাবিলদার গোছের লোক ওদের দু'জনকে ঠেলেঠুলে গাড়িতে বসাল। তারপর ওদের গাড়ি একজন চালাতে লাগল—অনিল দত্ত আর নিবারণ পাকড়াশি তখন পেছনের সিটে ঢলে পড়ে গেল। সেই অবস্থাতেই অনিল খুব আস্তে আস্তে গাইল—'কি করিলে বল পাইব তোমারে—রাখিব আঁখিতে আঁখিতে—এ—এ—'

গাড়ি মোড় নিল। নিবারণের মাথাটা অনিলের বুকে ঢলে পড়ল। তখনই পেছনে অয়ারলেস ভ্যানের হেডলাইট এসে পড়ল। নিবারণের বুকের ভেতর দিয়ে হার্ট ইত্যাদি কেউ নিঙড়ে দিল। অমনি চোখের গোড়ায় দু'তিন ফোঁটা জল এসে দাঁড়াল।

'রাখিব আঁখিতে আঁখিতে-এ-এ-এ'—বলে গেয়ে উঠল অনিল। আচমকা স্টিয়ারিংয়ের হাবিলদারকে বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি—?'

'থানেমে —'

॥ ১০ ॥

সুশীল বলছিল, 'নিবারণ কত অল্পদিনে আমরা স্বাধীনতা হারালাম—'

নিবারণের অফিস ছুটি হয়ে গেছে। ফাঁকা অফিসে দু'জনে বসে কথা হচ্ছিল। বিকেলের দিকে ডালহৌসিতে মেঘ করে আসে। তাই সুশীল আর নিজের অফিসে বসে থাকতে পারেনি।

'এই সেদিনও আমরা ইচ্ছেমত কলকাতা দখল করেছি—'

নিবারণ বলল, 'চল আমরা মিছিল করে রাজভবনে যাই। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে করতে শ্লোগান দেব—আঠেরো বছর—ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও—'

সুশীল হেসে বলল, 'পেছন থেকে আমরা বলব, 'দিতে হবে—দিতে হবে—'

নিবারণ সিগারেট ধরিয়ে সুশীলকে দেখছিল। সেকথা সুশীল অবশ্য টের পায়নি। মাথা নীচু করে কফির কাপে মুখ রাখছিল। মাথা ভর্তি কালো চুল। ভারি মুখে হাসি লেগেই আছে। সুশীলের বিয়ের পাঞ্জাবীর অর্ডার দিতে নিবারণ ক'বছর আগে সঙ্গে গিয়েছিল। ছাতি চল্লিশ। ঝুল চল্লিশ। ভগবানের নিজের কারখানায় তৈরি জিনিস। সলিড্। দুঃখে টাল খায় না। আগুনে পোড়ে না। সুশীলের গায়ে কোথাও লেখা নেই—গ্লাস উইথ কেয়ার।

'ভদ্রলোক হওয়ার পরেই আমাদের সর্বনাশ হোল। তাই না?'

'কত ফ্রি ছিলাম নিবারণ। যা ইচ্ছে হয় তা আর করার উপায় নেই। সব সময় ভয় হয়—লোকে কি বলবে।'

'আজকাল আণ্ডারঅয়ার পরে ঝুলবারন্দায় দাঁড়াতে লজ্জা করে। অথচ আগে চলন্ত ট্রামের প্যাসেঞ্জারদের রেগুলার ভেঙিয়েছি—'

'আমি তো ক্লাস টেন অব্দি আমাদের মফঃস্বল শহরের রাস্তার লাইট পোষ্ট থেকে শুক্লপক্ষে হামেশা ডুম খুলে নিতাম। লাট দরে বেচে দিয়ে কত ডেভিল খেয়েছি—'

কাটা কাপড়ের দোকানে এসপ্ল্যানেডে হাঁটার উপায় নেই। বড় বড় দোকানে কায়দা করে লেখা: রেমনানট্স্ অ্যাট রিডাকসন। কোটি কোটি চিরুনিতে ফুটপাত ছেয়ে ফেলেছে। সন্ধ্যের আলোর সঙ্গে জ্বলন্ত নিভন্ত নিওনের আলো তিব্বতী ফেরিঅলাদের আরো রঙীন করে দিচ্ছিল।

'আসলে সুশীল আমরা কয়েক বছরের জন্যে লোক হয়ে গিয়েছিলাম। আজকাল পকেটে কত জিনিস থাকে দেখেছিস—মান্থলি, রুমাল, চশমা, মানিব্যাগ—বর্ষায় ছাতা প্লাস ওয়াটার প্রুফ—অমরেশের আবার গামবুটও থাকে—'

সুশীল ভিড় ফুঁড়ে এগোচ্ছিল। কিছুটা অবাক হয়ে তাকাল।

'মানে আমরা কত পরাধীন বল। আগে পথে বেরোতে আমাদের এত জিনিস লাগত? ইদানীং আমার মাথা ধরে—অন্যের মত সারিডনও খাই। আজ তিন বছরে অন্তত তিন দিন অম্বল হয়েছে। যে কোন বিয়ে বাড়িতে পারতপক্ষে লুচি ছুঁই না—ডালডা এড়িয়ে চলি। তাহলে বল সর্বনাশের আর বাকি কি!'

'কোন ব্যাপারে কোন ইণ্টারেস্ট নেই। সেটাই ভয়ের কথা।' ঠিক সুশীলের কথা ফুরলো অমনি স্পেন্সার থেকে একজন সতেজ মেয়ে বেরিয়ে এসে একটা দাঁড়ানো ফিয়াটের দরজা খুলে ফেলে স্টিয়ারিংয়ে বসল আর ভুস করে বেরিয়ে গেল। সুশীল আর নিবারণ দু'জনই তাকিয়ে দেখছিল। সুশীল বলল, 'যা কিছু ছিটেফোঁটা আগ্রহ পড়ে আছে তা হল এইসব জিনিসে। খানিকক্ষণ চাঙ্গা হয়ে থাকি—অবিশ্যি খানিক পরেই আবার ধপাস্! আমি যে কত লোকের জ্যাঠামশাই, পিসেমশাই, ভায়রাভাই, ভগ্নীপতি হয়ে গেলাম এ ক'বছরে!'

'দুঃখ করিস না। দিন আসবে। আবার দিন আসবে আমাদের—'

'কবে আর আসবে নিবারণ! এ জন্মে না—'

'আসবেরে দেখিস। তখনকার জন্য তৈরি থাকিস। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমার কি হয়েছে জানিস—খবরের কাগজ খুললে মনে হয় আমি কোন বিদেশে শরণার্থী হয়ে আছি। এখানকার সরকার, এখানকার পার্টি, এখানকার সিনেমা, নাটক, লেখক, হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চারা সব অচেনা—বিলকুল ফরেন। আমি একটা বিরাট সিনেমা হলের মাঝখানে ইণ্টারভ্যালে আমার সিট খুঁজে বেড়াচ্ছি—অর্কেস্ট্রায় গান হচ্ছে—কাজুবাদাম, চিপস্ বিক্রি হচ্ছে—সামনের হাজার মিলিমিটারের শাদা স্ক্রিনে কোন রঙ কোনদিনই ফুটবে না—'

একজন ব্রিটিশ ভাইসরয়ের মূর্ত্তির পাদদেশে বসে ওরা দু'জনে ময়দানের নানান্ অখাদ্য ঘন ঘন খেতে লাগল। সুশীলের মনে পড়ল —এই শহরে একটা নদী সবসময় দোকানপাটের আড়ালে পড়ে থাকে। এখানে পুলিশ ও মানুষ ফেয়ার প্রাইস শপে রেশন নেয়—রবীন্দ্রজয়ন্তী করে। ভদ্রলোকরা লোমহর্ষক খুনে যোগ দেয় না। সুন্দরী, কুচুটে পরস্ত্রী ইলোপ করাও উঠে গেছে একদম।

আসলে বিস্মিত হওয়ার আর কিছুই থাকছে না। রোজ ঘুম থেকে উঠে দেখি চা খেতে হবে এবং তারপরেই পায়খানায় সিটিং—'

'নিবারণ আজ তিন বছর আমাকে কেউ ভালো করে অপমান পর্যন্ত করেনি। সবাই কেমন হাফ হার্টেড্, বিবেচক—বিবেক ক্লাসের লোক হয়ে পড়েছে। আগে শ্রাদ্ধবাড়িতে শেষপাতে গিয়ে বসেছি। রাধাবল্লভি খুব ফেবারিট ছিল। তখনকার কর্তারাও খুব স্ট্রিক্ট ছিলেন। চেক করে পরিবেশন হত। কতবার পংক্তিভোজ থেকে রবাহুত বলে তুলে দিয়েছে। ইনসাল্ট! তাতে কি। ভাল লাগত!

এখন সবাই ধরে ফেলেও ছেড়ে দেয়—আমি যদি কারো বউকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম—নতুন শহরে ফ্রেস ঘরকন্না করা যেত—'

'রেবাকে নিয়ে যা। খুব কোঅপারেটিভ।'

'রাজি হবে?'

'ঘন ঘন আমার বাড়িতে যাও। আমার অসাক্ষাতে দু' একবার জড়িয়ে ধর। আমি ঠিক চোখ বুজে থাকব। তখন গরম নিঃশ্বাস ফেলে সেকেণ্ডে একটি চুমু খাবে—'

'তোর কষ্ট হবে না?'

'এইতো মুশকিলে ফেললি। তুই চিরকালের ভদ্রলোক। উপরন্তু আমাকে বোধ হয় একটু আধটু ভালবাসিস।'

সুশীল সেদিক দিয়েই গেল না। আচমকা বলল, 'জানিস একদিন স্বপ্নে দেখি দু'টো পাহাড়ের ভেতর একটা সবুজ উপত্যকায় আমার বউকে কে একজন পাজাকোলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি অসহায় দর্শক। আরেকটু পরেই লোকটা পাহাড় টপকে চলে যাবে। উঃ! সে যে কি কষ্ট নিবারণ—'

'আমার আজকাল কোন দুঃখকষ্ট হয় না। আনন্দ, শোক—তাও বোধ হয় অনেককাল হয় না।' হঠাৎ নিবারণ বলল, 'লক্ষ্য করে দেখেছিস—আমাদের কোন প্রোগ্রাম নেই—কোন টাইমটেবল নেই। আমাদের জন্যে কোন ট্রেন ছাড়ে না—

'চল ফূর্ত্তি করে আসি—'

'কোথায় যাবি?'

'সোনাগাছি—'

'নাথিং এনচ্যানটিং। কাপড়জামা খুলে পাঠাখাসির মত সেই এক ঘসাঘসি—পুরনো।'

'বাঃ! তোমার জন্যে নতুন রাস্তা বেরোবে নাকি।'

'ছোটবেলায় মাকে দেখতাম রুটি সেকে জল ছিঁটিয়ে রাখতেন। কখনো কখনো দু'খানা রুটি দু'হাতে ধরে ঘসাঘসি করে গায়ে মাখানো

গুঁড়ো আটা ঝেড়ে ফেলতেন। আমরা কি বিবাহিত হয়ে এই গুঁড়ো আটা ঝেড়ে আসছি না ক' বছর? কেমন ভিজে! আঠা আঠা—'

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। ময়দান জুড়ে এখানে ওখানে থরে থরে গ্রেটনেস সাজানো। গোখলে, চিত্তরঞ্জন, নেতাজী। ওঁদেরই মত আমরাও দুঃখ পাই, ক্ষিধে পেলে খাই। লাইফ ইজ নট এ মোর্ণফুল নামবার! আহাহা! কে লিখেছিলি!

'চল আমার গাড়িতে পৌঁছে দিই তোকে।'

'নারে নিবারণ। দরকার নেই। আমার কোন যাবার জায়গা নেই আজ। তুই চলে যা। আমি বেশ একা একা হাঁটব। কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটব।' বলেই মনে হল, খুব পোয়েটিক কথা হয়ে গেল। তাই লজ্জা হল সুশীলের।

'চল না মাখনের ওখানে যাই। মাখন থাকলে বেশ মজা হবে।'

'না থাকলে?'

'তা সত্যি। লতা একা থাকলে সাত কাহন করে বলবে—পৃথিবী ওর সঙ্গে কি কি অন্যায় করেছে। ওর নাকি আরও কি কি পাওয়ার কথা ছিল। সবাই ষড়যন্ত্র করে পেতে দেয়নি।'

'তোদের অনিল দত্তর ঘোর কেটেছে?'

'বুঝি না। বোধ হয় কেটেছে।'

বৃষ্টি এসে গেল বড় বড় ফোটায়। ম্যাঙ্গো লেন এখান থেকে অন্তত দু'ফার্লং।

দু'জনে দৌড়ুচ্ছিল। তার ভেতরেই সুশীল বলল, 'ভদ্রলোকের জন্যে আমার মায়া হয়। শীতকালে শিয়াখালা গিয়েছিলাম। লাইট রেলের কামরার জানলায় বসে হাওয়া খাচ্ছি। হঠাৎ দেখি কালো অ্যামবাসাডার—স্টিয়ারিংয়ে তোদের অনিল দত্ত—পাশে লতা—কি কথায় যেন হাসছে—'

হাফাতে হাফাতে ওরা দু'জনে প্রাইভেট বাসের আড়তে এসে পৌঁছালো। নিবারণ আর দাঁড়াতে পারছিল না। কোন রকমে

একটা ফাঁকা বাসে ঢুকে পড়ে লাংস্ ভরে বাতাস নিতে লাগল। ওরে বাপস্। জলের অপর নাম জীবন। আজ জানল বাতাসের আরেক নাম আয়ু। ফুরিয়ে গেলে যে কি হয়! হঠাৎ দৌড়ে এমন অবস্থায় না পড়লে বোঝাই যায় না।

সুশীল হ্যাণ্ডেল ধরে পাদানিতেই দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে নিবারণকে দেখছিল। আর নিবারণ—এই সেদিনেরও যুবক নিবারণ পাকড়াশি লজ্জায় কাশতে কাশতে স্বাস্থ্যে, দমে ভরপুর সুশীলকে ওরই ভেতর চোখ তুলে দেখছিল। সুশীলের লোম মাখানো মোটা ফরসা হাতখানা অনেকখানি রক্ত চামড়ায় ছড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে সুশীলকে সোজা দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সুশীল এতখানি দৌড়েও একটুও চলকায়নি, 'তোকে দিয়ে আসি চল। ড্রাইভার এসেছে তোর—'

অফিসের দরজায় এসে সুশীলকে আর যেতে দিল না নিবারণ, 'চল আমার সঙ্গে।' আবার রেড্ রোড্। বড় ফোঁটার বৃষ্টির সঙ্গে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল। উইণ্ডস্ক্রীনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রাজসিক বাড়িটা ফ্রেমের ছবি হয়ে ভেসে উঠছিল। নিবারণ আর সুশীল পেছনের সিটে হাত ধরাধরি করে বসে আছে। গাড়ি প্রায় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ছুটছিল। আচমকা একটা বড় গাছের কাছে এসে কয়েকটা আওয়াজ তুলেই থেমে গেল।

নেপাল ড্রাইভারকে গাড়িতে বসেই নিবারণ নানা রকম ডিরেকসন দিচ্ছিল। বনেট তুলে ফেলে, গাড়ির নীচে শুয়ে ঠুকঠাক করেও নেপাল চালু করতে পারল না। আকাশ অন্ধকার করে একটা বড় বৃষ্টি খানিক পরে আসবে বলে চারদিক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। এমন জায়গায় নেপাল সমেত গাড়ি ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না।

'কি করবি সুশীল?'

অনেক গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। সুশীল বলল, 'চল ঠেলতে ঠেলতে ভিক্টোরিয়া অব্দি এগোই।'

নেপাল স্টিয়ারিংয়ে—গাড়ির পেছনে সুশীল আর নিবারণ। বেশিদূর এগোতে হল না। একটা বেশ মোটামত গাছের গুঁড়িতে গা লাগিয়ে একজন লোক হাওয়ার ঝাপটা ঠেকাচ্ছিল। হাতে একটা রঙচটা চামড়ার ব্যাগ। দিব্যি এগিয়ে এসে বলল, 'ঘাসের ওপর সাইডিং করুন—দশ মিনিটে ঠিক করে দিচ্ছি।'

সুশীলের অবাক লাগল। গড়ের মাঠে অন্ধকার বিকেলে মোটর মেকানিক। একেবারে দেবদূতের স্টাইলে উদয়। লোকটা তখন মোটরের নীচে চলে গেছে।

সুশীলের অবাক ভাবটা কাটিয়ে দিতে নিবারণ বলল, 'কলকাতায় মোটরের আপদে বিপদে যেকোন সময় যেকোন রাস্তায় মেকানিকরা এমনি আচমকা হাজির হয়।'

'আসলে বোধহয় এদের একটা লার্জ সেকসন আনএমপ্লয়েড্।'

'তুইও সুশীল!'

'কি?'

'সবার মত অমনি স্ট্যাটিসটিকস্ আওড়াস। কিংবা অপ্রিয় জিনিসের মুখোমুখি হতে ভয় পাস বলে অ্যাভয়েড্ করিস।'

'কিরকম?'

'কোন প্রবলেম দেখলে আমার মত হেড-অন-ক্লাস করতে সাহস হয় না তোর—'

'লাভ কি! আমি একা একা তো আর পৃথিবীকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারব না।'

'সবাই মিলে একা একা ভালো হলে দুনিয়া ভালো হয়ে যায়—'

'সে তো সাধুদের কথা!'

'চিরকালের কথা। লোকে একা একাই গান গায়। ডুয়েটের আসল নাম দৈত্য সঙ্গীত!'

'আমি জানি। একা একাই লোকে ভালবাসে—'

সারা গড়ের মাঠ জুড়ে একটা বৃষ্টি আসছিল। তার চেয়েও বড় করে নিবারণ ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল। ভালোবাসা যে স্নিগ্ধ নীলচে আলো দেয়—প্রায় তার সমান মোলায়েম আলোয় রাজা উইলিয়মের দুর্গপ্রাকার, মাঠের কোনাকুনি সারি সারি সাবু গাছের থাম, অসহায় ঝুলে পড়া আকাশটা ভীষণ কোন বজ্রপাত কিংবা ঝোড়ো হাওয়ার জন্যে বুক পেতে অপেক্ষা করছিল।

মেকানিক স্টিয়ারিংয়ে বসেই আচমকা স্টার্ট দিল। নেপাল মোটা গাছটার গোড়ায় পেচ্ছাবে বসেছিল। গাড়ি তো থামছে না। তখন সুশীল, নিবারণ, নেপাল দৌড়তে লাগল। নেপাল চেঁচাচ্ছিল।

কয়েকখানা গাড়ি ব্যাপারটা বুঝেই এমনভাবে গিয়ে সাইডিং করল—গাড়িখানা নিয়ে মেকানিক প্রায় দু'ফারলং দূরে গিয়ে থামতে বাধ্য হল।

সবার আগে নেপাল পৌঁছল। তারপর নিবারণ আর সুশীল। ততক্ষণে তিন চারখানা গাড়ি থেকে প্রায় জনাদশেক লোক নেমে পড়েছে। একজন ষণ্ডামত লোক একখানা জিপগাড়ি থেকে নেমে সবার আগে গিয়ে মেকানিককে নামাল। লোকটা ছুটে পালালেও পারত। নিবারণ তাই চাইছিল। দেরি হয়ে গেছে।

লাল ক্রস আঁকা একখানা ফিয়াট থেকে সবার শেষে একজন ডাক্তার নামল। চোখে চশমা—সাত্ত্বিক মুখচোখ। নিবারণ তাকে দেখেই বলল, 'দেখুন তো মশাই কি গেরো! কোথায় বেরিয়ে যাব —তা না ঝামেলায় জড়িয়ে যাচ্ছি।'

ডাক্তারবাবু স্টেথেসকোপটা ট্রাউজারের ডান পকেটে গুজে এগিয়ে গেলেন ভিড় ঠেলে, 'পিঠের এই হাড়টার নীচে মারুন।' সঙ্গে সঙ্গে সেই ষণ্ডা মত লোকটা সেখানে মারল। মেকানিক 'বাবাগো' বলে বেঁকে গেল খানিকটা।

ডাক্তার বিড় বিড় করে বলল, 'আমার তিন তিনবার টায়ার চুরি গেছে। এ শালাদের আমি চিনি। একবারও ধরতে পারিনি—'

মেকানিক কাৎরাচ্ছিল। সুশীল নিবারণকে বলল, 'ছাড়িয়ে দেনা! লোকটা তো গাড়িখানা সারিয়ে দিয়েছে—'

ডাক্তার বলল, 'উইক হবেন না। দয়ালু হয়ে হয়েই তো আমরা দেশটা রসাতলে দিলাম।' তারপর ডাক্তার ভিড় ঠেলে আবার এগিয়ে গেল।

সেই ষণ্ডা লোকটা আরেকজন রোগা চিমসে লোক মিলে মেকানিকের ডান হাত খানা তুলে ধরেছে। মেকানিকের কষের দাঁত বেয়ে রক্ত পড়ছিল। সার্টের বোতাম সুদ্ধ একদিকের কাপড় ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে।

ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁ এখানে মারুন। ঠিক ল্যাটিস ডরমাসের নীচে—এখানে একখানা পাতলা হাড় আছে। ভাঙলে আর জোড়া লাগেনা—' বলে নিবারণের দিকে তাকাল, 'আর বাছাধন কোনদিন আস্ত একটা গাড়ি চুরি করতে বেরোবে না—'

সুশীল ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। নিবারণ পাগলের মত গাড়ির অন্যদিকে গিয়ে মেকানিকের এক পাটি জুতো কুড়িয়ে পেল। মেকানিক আরেকবার চেঁচাল, 'ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমায়—' কথা শেষ হল না। তখন মুখে চোখে এলোপাথাড়ি ঘুসি পড়ছে।

সুশীল ভিড় ঠেলে এগোতে পারল না। নেপাল কোনক্রমে স্টিয়ারিংয়ে গিয়ে বসতে চাইছে। কিন্তু পাবলিক এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাক চাইছিল না।

এমন সময় সেই বৃষ্টিখানা এল। বড় বড় ফোঁটায়। লোকজন হুদ্দাড় নিজেদের গাড়িতে ফিরে গেল। স্টার্ট নেওয়ার আগে ডাক্তার বাবুটি তার গাড়ির কাচ নামিয়ে খুব আত্মীয়ের মত বলল, 'কোন চেনা জায়গা থাকলে সেখানে নিয়ে গিয়ে লোকটাকে আরও দু'চার ঘা দিন—'

সুশীল আর নিবারণ মিলে মেকানিককে পেছনের সিটে নিয়ে এল। রং চটা ব্যাগটায় কালি মাখানো কতকগুলো রেঞ্চ, দুটো মাইকো প্লাগ—একখানা প্লাস পাওয়া গেল। রবারের পাম্পসু বলে সহজেই পায়ে পরিয়ে দিল নিবারণ। লোকটা তখনো ব্যথার ভেতর নাকের রক্ত মুছতে মুছতে বলছিল, 'কাইগুলি স্যার আমায় থানায় দেবেন না—'

পি জি হাসপাতালের গেটে পৌঁছে সুশীল বলল, 'হাসপাতালে তো এ কেস নেবে না। বলবে থানা হয়ে আসুন—'

নিবারণ বুঝলো, থানায় গেলে পুলিশ প্রথমেই জানতে চাইবে—লোকটাকে মেরেছেন কেন?

সুশীল বলল, 'তুই বলছিলি কলকাতার রাস্তায় যে কোন সময় মোটর মেকানিক পাওয়া যায়—'

নিবারণ মুখ তুলে চাইল।

'আরও একটা জিনিস সর্বত্র পাওয়া যায়।'

'কি?'

'মানুষ পিটিয়ে হাতে সুখ করে নেওয়ার অজস্র মানুষ—সব জায়গায় সব সময় তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে—মানে বারোয়ারি পাবলিক!'

'কিন্তু লোকটাকে নিয়ে এখন কোথায় যাই বলতো সুশীল?'

কিছু না ভেবেসুশীল বলল, 'চল মাখনের ওখানে যাই—'

গাড়ি ঘুরলো। গলির মুখ থেকে সুশীলই লোকটাকে কোলে করে লতাদের বসার ঘরে নিয়ে এল। নিবারণ পাশে পাশে রং চটা ব্যাগটা হাতে নিয়ে হাঁটল। নেপাল গাড়ি নিয়ে বরফ আনতে ছুটলো। এই সুশীল একদিন নিবারণকে বলেছিল—জানিস ভাই—

আমার না চিনে বাদামের খোসা ভাঙতেও মায়া হয়। ইট চাপা ফ্যাকাসে ঘাস দেখলে দম আটকে আসে। একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম —আমি বিরাট দিঘিতে দম বন্ধ হয়ে ডুবে যাচ্ছি। আসলে আমরা সবাই বেশি করে ভালো করে বাঁচতে চাই।

লতা গরম জল করে এনে দিল। সন্ধ্যের আলোয় ঘরে ঘরে রেডিওর গান। নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়ায় ছেলেমেয়েরা সুর করে ইতিহাস ভূগোল মুখস্ত করছে। মাখন ফেরেনি। লতার বড় ছেলেটা ছুটে গিয়ে ডেটল নিয়ে এল।

চা করতে করতে লতা সর্টে সব শুনলো। তারপর বলল, 'আজ তুমি অফিস থেকে দেরিতে বেরিয়েছ।'

'কি করে বুঝলে ?'

'সিম্পিল। বেরোবার সময় দেখলাম মাথা নিচু করে কপাল টিপছ। তারপর এখন দেখছি সুশীলবাবু সঙ্গে—'

সুশীলের ওপর দিয়ে এতক্ষণ নানারকমের ভাবনা বয়ে গেছে। অল্প সময়ে কত কি হয়ে গেল। পাশের ঘরে মেকানিক শুয়ে। নেপাল তার পায়ে কাটা জায়গায় বরফ ঘসছে। বুকের জামা তুলে ফেলে রক্তজমা কালসিটের ওপর বরফ বুলোতেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠছে।

এঘরে শীতল পাটির ওপর পা ছড়িয়ে লতা বসে। পুজোয় কাপড় জামার বিজ্ঞাপন থাকে কাগজে। সেরকম কোন পদ্মসায়া কিংবা কিছু পরে আছে। লেসের কাজ পায়ের ওপর ঘিরে পড়ে আছে। ছোট ছেলেটা পাশের ঘরে রান্নার লোকের সঙ্গে লুডো খেলছিল। একবার শোনা গেল 'দু'ছক্কা পাঞ্জা।' একদিন মাখন না বলেছিল, ট্যাবলেটের বিট্রেয়াল।

'আমি কাছে থাকলে বুঝি লোকের দেরি হয়—'

'তা বলিনি। নিবারণকে তো জানি। ও আজ বন্ধুকে পেয়ে ন জানি অনেক ঘুরেছে নিশ্চয়—'

'আমরা অনেকদিন বন্ধু। এ আর নতুন কি!'

লতা বেশ খানিকটা রহস্য মাখিয়ে হাসল, 'তাই বুঝি!'

অস্বস্তি লাগছিল নিবারণের। এইমাত্র খানিক আগে ময়দানে একজন সাহায্যকারী ও চোরকে রাগে কবন্ধ কিছু লোক শরীরের দুর্বল জায়গাগুলো বেছে নিয়ে একজন ডাক্তারের নির্দেশে পিটিয়ে ভেঙে দিচ্ছিল। একেবারে দিনের আলোয় হিংস্র কিছু লোক একদম খোলাখুলি ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার রাস্তা পেয়ে কেমন নিখাদ রাগে ঝক ঝক করে উঠেছিল।

অথচ আমি তো এইসব মানুষ—পৃথিবীর বুকের হাড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে, হাঁটতে বিশাল গাছের শুকনো বল্কলের গন্ধ পাই। সেখানেই ভালবাসা নীলচে আলো হয়ে জ্বলে ওঠার কথা। কেননা বুকের দু'ইঞ্চি নীচেই হাড়, মাংস, চামড়া, চর্বি ওলট পালট করে দিয়ে আরেকটু নামলেই আত্মার আভা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়বে।

লোকটার কাৎরানিতে সুশীল উঠে গেল। লতাও যাচ্ছিল। নিবারণ হাত টেনে ধরল। লতা অবাক হয়ে ফিরে তাকাতেই নিবারণ কোন পরোয়া না রেখেই বলল, 'মাখন তো তোমাকে অনেকদিন পায়।'

লতা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'আবার—'

নিবারণ ঘোরলাগা মানুষের ধারায় লতার বুকে নিজের দু'খানা চোখই চেপে ধরল। নাকের ওপর ওর ব্লাউজের সেফটিপিনের দু'টো সরু শক্ত রেখা বসে গেল। লতা আস্তে আস্তে নিবারণের চুলে হাত রেখে মাথার গন্ধ নিল, 'কি হয়েছে বলতো তোমার—রেবা এখানে?'

নিবারণ প্রত্যেকটা কথা লতার বুকের ভেতর ঠোঁট চেপে ধরে বলল, 'আমি একদম মিশে যেতে চাই। জোড় মেলানোর কোন দাগ থাকবে না—'

লতা খুব আস্তে নিবারণের মাথায় ঠোঁট ছুঁয়ে রাখল। নিবারণ

আরও ঘন করে লতার বুকে চলে যেতে চাইছিল। ডান হাতখানা কোমর ঘিরে আস্ত লতাকে আরও কাছে আনল। অনেকদিনের ধারণা, বুকের আলগা কাপড়খানা সরিয়ে দিলেই সবুজ গাছ পালায় ছায়াচ্ছন্ন কোন নদীতীর বেরিয়ে পড়বে। সেরকম কিছু দেখা দিল না। নিবারণ নরম জায়গায় বোজা চোখ চেপে ধরে আরাম শুষে নিচ্ছিল শুধু।

লতা পড়ে যেতে যেতে ঠেলে উঠে বসল, 'কি হচ্ছে নিবারণ?'

নিবারণ কোন উত্তর দিল না। মুখ ঘসতে ঘসতে বুকের সেই জায়গাটা খুঁজে পেল। পিচবোর্ডের চেয়েও পাতলা হাড়। চাপ দিলেই মুট করে ভেঙে যাবে। আজই খানিক আগে রেড রোডে ডাক্তারটা কেমন শরীরের জোড়ের জায়গাগুলো খুলে ফেলে ভগবানের ঝালাই তুলে লোকটাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করছিল। নিবারণ মাথা, কপাল, চোখ মুখ দিয়ে লতার বুকে জোড়ের জায়গায় চাপ দিল। এখান দিয়েই আলো ঠিকরে পড়ে। আবার দিল। আবার লতা গরম নিঃশ্বাস সুদ্ধ মুখখানা নিবারণের কাঁধে চেপে রাখল।

'লাগে না? আঃ!'

মুসকিল হয়েছে সুশীলের। লোকটাকে টান টান করে শুইয়ে দিয়ে এঘরে ঢুকতে পারছে না। ঘরের ভেতর একটা অজ্ঞান লোককে ফেলে রেখেও বেরোনো যায় না। লতার বড় ছেলেটা ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলে ভাল হত।

॥ ১১ ॥

খানিকক্ষণ হল জেল হাজতে আমাকে আনা হয়েছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর খুব অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল শুধু স্বাভাবিক দেখলাম রেবাকে আর শশধর উকিলকে। ওরা দু'জন আমার কাছে কি চায়। শশধর চায় আমি তাকে মামলায় জেতাই। রেবা চায় আমি জেল থেকে বেরিয়ে আবার আগেকার নিবারণ পাকড়াশি হয়ে যাই। বারে হালুয়া!

দুনিয়া যেখানে ছিল আবার সেখান থেকে স্টার্ট দিক। তাইতো! তাকি আর হয়। আমি আর কারো সঙ্গে কোনরকম কমপ্রোমাইজ করছি না। জীবনের দশআনা বাঁচা হয়ে গেল। এখন কিছু সত্যি কথা—উচিত কথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলতেই হবে।

যেমন—

রেবা আমি তোমার বিবাহিত স্বামী ঠিকই—কিন্তু, বিয়ের সরকারী টিপছাপ ছাড়া আর কোন সিল নেই যা আমাদের বেঁধে রাখতে পারে। তুমি মায়ামৃগ ছায়াছবিতে সন্ধ্যা মুখারজির গলা কাঁপানো গান খানাকে আজো মনে কর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ গান। আমার মনে হয় পোড়া বিড়ির ছাই।

আমরা কি আদপেই একাত্ম? তোমার দেহের রহস্য এখন আমার কাছে শাদা কাগজ। এসব লুকিয়ে আর লাভ নেই।

আমি একটা বয়সে শুধু নারী ও শিশুতেই রূপের ছোঁয়াচ লেগেছে দেখতে পেতাম। তখন তুমি ভোর ভোর চান করে উঠে রোদে রীতিমত আভা ছড়িয়ে লাল শাড়ি পরে বেরোতে। দম্ভ, মায়া, রহস্য সবই একই শরীরে লেগে থাকত। আমি লুকিয়ে তাকাচ্ছি জেনে তুমি আরও বেশি করে ব্যাগ ঘাটতে কিংবা মাথা নীচু

করে হেম সেলাই দিতে ব্লাউজের হাতায়। অথচ এই তুমি ব্যাসনে ডুবিয়ে যখন গরম গরম বকফুল ভাজা খেতে—তোমার ভেতরকার অনেকদূর আমি দেখতাম। মনে মনে বার বার অনুরোধ করেছি—ওভাবে আলজিভ অব্দি না দেখিয়ে কি তুমি গরম ভাজা খেতে পার না। কাইগুলি ভেবে দেখো।

সেসব সময় আমার ভুরু কোঁচকানো, স্পষ্ট আপত্তি তোমাকে কিছুতেই টলাতে পারেনি। কিংবা মনে করে দেখ, সংসারে সাশ্রয়ের জন্যে তুমি যখন কাপড় কাচাকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করলে—তোমাকে ফ্যাকাসে আঙ্গুল গুলোতে যখন ক্রিম লাগাতে হল—কিংবা গুঁড়ো কয়লার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে গুল দিতে লাগলে ছাদে—তখন কি আমি সরে যেতে শুরু করিনি। শুধু বলতাম ঃ রেবা তুমি বদলাও। নয়ত ভীষণ বিপদে পড়বে। তোমার ভীষণ বিপদ আসছে।

'কেন ? এসব কথা বলছ কেন ?'

আমি এর চেয়ে বেশি বলতে পারিনি। শুধু বলেছি, 'তুমি সাবধান হও। পরে আমাকে দোষ দিও না। তখন আমার গায়ে হাত দিয়েও আমাকে ভেতরে ছুঁতে পারবে না।'

'অন্য কোথাও বিয়ে বসছ—'

'তুমি ওইটুকুই ভাবতে পার মোটে—', মূর্খ বালিকা। ঈশ্বর তোমাকে বাটালি-কাটা নাক চোখ দিয়ে থাকতে পারেন—কিন্তু তাতে তো আমি একবার বিমোহিত হয়েছিলাম—এখন অবশ্য আর অনুগত থাকা যাচ্ছে না।

'আসলে রেবা আমি এখন অনেক জিনিস সুন্দর দেখতে পাই। আগে পেতাম না।'

তুমি তাকিয়ে থাকলে আমার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'লতাকে ?'

'কোনদিনই না। এইতো! সেই ভুল কবলে! লতা ইউটিলিটি সার্ভিসের চেয়ে বেশি কিছু নয়। বলতে পার ট্যুরে বেরোনোর

ফ্লাস্ক।' তারপর অনেক থেমে থেমে বলেছিলাম : আমি আজকাল অনেক ব্যাপারে রূপ খুঁজে পাই। বিকেলবেলা পেট্রল পাম্পে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচ দিয়ে একটা গাড়ি ব্যাক করছে—রিকসা সাইকেলের জটলা ছত্রাকার হয়ে গেল। লাল রঙের চার্চের গাছতলায় পথিক সাঁওতালরা ছাতু মেখে খাচ্ছে। এসব ছবি তো কোন্ আদিকালের কথা মনে করিয়ে দেয়। তুমি কি এসব বুঝতে পার। এসব ছবির স্বাদ পাও? এই সব ছবির ভেতর দিয়ে অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে ঘুরে আসতে পার?

অনিলদার চোয়ালের লাবন্য কিংবা কষের দাঁত তোলার পর তার মাথায় খানিকটা শাদা হয়ে গেলে তুমি কি তাঁকে সুন্দর দেখতে পাও। ভুল যুক্তি দিয়ে সে যখন তার সময়কে সাপোর্ট করে—তখন কি তুমি অনিলদাকে ক্ষমা করে বয়সের কাছে অসহায় বুঝতে পেরে ভালবাসতে পার। মনে করতে পার—অনিল দত্তর ভেতর দিয়ে তরমুজের ভেতরের ডগডগে খাঁটি লাল ১৯৩৭ সারা মাঠ জুড়ে পড়ে আছে—

ধাক্কা দিয়ে খুললেই সবটা এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাবে। তখন মানুষকে মানুষ শুধু ভালবাসবে। সেই ভালবাসায় বাঁধা আমরা শুধু নিজেরাই। শিশু বয়সে ঘুনসি লটকানো বালক মাত্রই ভালবাসার পুতুল। ক্রমে ক্রমে ভদ্রতা, আব্রু ইত্যাদি মানুষকে আক্রমণ করে পরাভূত করে ফেলার পর খড়ের ভেতর দিয়ে আমরা শুধু মাথাটুকু জাগিয়ে রাখি। রোজ ভদ্রতায় আক্রান্ত, আবরনীতে আবৃত, পৈতৃক নামে চিহ্নিত—আমরা এক একটি মানুষ তলিয়ে যাচ্ছি। হাতের চেটোতে মুখ মুছি না—রুমালে মুখমণ্ডল মার্জনা করি! ফলম্ তথৈবচ।

আমার বুকের ভেতর আত্মার ডেলাটি এক বালতি রক্তে টালমাটাল হয়ে ভাসছে। আরও কতকাল ভাসবে। অন্ধকার হয়ে এলে লাল রক্তে কালো ছায়া পড়ে। তারপর সেখানে স্নিগ্ধ নীল

আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই আলোয় তুমি কি হাঁটু রক্তে দাঁড়িয়ে আমার ভালবাসাবাসির সঙ্গে মেশামিশি করতে পার।

আমার নামই আমার সম্পত্তি। আমার নামই আমার দায়িত্ব। সে দায়িত্ব ব্রহ্মাণ্ডে সমিতিবদ্ধ। সেখানে মেশামিশি, ভালবাসাবাসির দর ওঠানামা করে না। সবই নিস্তরঙ্গ, গভীর, অতল।

আমি জানি আমি তোমাকে কিছুই বোঝাতে পারছি না।

আমার গভীর সন্দেহ, যারা এসব কষ্ট করে জানবেন—তারাও বুঝবেন না। হাড়, মাংস ছত্রাকার করে দিয়ে অনিলদার বুকের দু'ইঞ্চি নীচেই আমি মেশামিশির নীল ডুমের আলো দেখতে পাই। শ্লেষ্মা,পিত্ত, কফ, বায়ুতে ভরপুর এই দেহ আমাদের ষ্টেশনে পৌঁছতে দেয় না। সুখ, আরাম, কষ্ট সৃষ্টি করা হয়। ওদের বেড়াজালে আমরা পড়ে যাই। আমি এই মায়াজাল ধরতে পেরে লক্ষ্য আগেই স্থির করে নিয়েছিলাম। বুকে বুক লাগিয়েও রেবা আমি কি তোমাকে পেয়েছি? তোমার ভেতরে পৌঁছতে আমি আর পাঁচজন পুরুষের মতই সর্বাঙ্গ দিয়ে তোমাতে লেগে যেতে চেষ্টা করি নি? এখানে 'তোমাতে' কথাটা কোন্ কারক? সম্প্রদান না অধিকরণ? ধোপাকে কাপড় দাও? বনে বাঘ বাস করে! ঘরেতে ভ্রমর এল·····

লক্ষ্য আমার স্থির ছিল। কারণ আমি জানতাম, ভালোবাসার আলোয় অন্তত একবার আমাকে স্নান করতেই হবে। তাই বলে কি আমি ঘোরে ছিলাম? মোটেই না। আমি জানতাম, রাজনীতি আছে, সরকার আছে, বাস স্ট্রাইক হয়—নিজের দলের লোক খুন হলে তাকে শহীদ জ্ঞানে গণশোক করে মালা দিতে হয়। এসব তো আছেই। লোহার ব্যাজের রেট নিয়ে দর কষাকষিও করতে হয়েছে আমাকে। গাড়ি কেন বেশি বেশি মবিল খাচ্ছে তাও আমি লক্ষ্য রাখতাম। উপরন্তু অফিসে আমার চেয়ারে এবং মোটরে আমার সিটে—দু'জায়গায় আমি দু'খানি আকাশি রঙের তোয়ালে রেখেছিলাম। তাতে আমার বসতে আরাম হত। সুখ হত। এবং ওই দু'টি গদি

যে আমারই তার মৌরসি সিল ছিল ওই দু'খানি তোয়ালে। অথচ আমার দায়িত্ব ব্রহ্মাণ্ডে সমিতিবদ্ধ।

লক্ষ্য স্থির রেখেই আমি এগোই। বুকের প্লেট খানা উঁচু করে ধরলেই জানতাম চাপা আলো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। তা যে-এতটা চোখ ধাঁধিয়ে দেবে তা আমি আগে ভাগে বুঝতে পারিনি।

বড় সাত পেগ মাত্র আড়াই ঘণ্টায় আমার শরীরে চলে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারছিলাম এবার কেবিনের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেই আমার কপালে যেই ঠাণ্ডা হাওয়া লাগবে—অমনি আমি মাতাল হয়ে যাব। আমি এই ভদ্র পৃথিবীর সব খড় পায়ে চেপে ওপরে ঠেলে উঠতে চাইলেও আমি স্টেডি থাকতে পারব না।

অনিলদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ভালবাসতে চাইছিল। অনিলদা আমার চেয়ে কিছু বেঁটে। তার মাথাটা, মাথার চুল আমার নাকে লাগছিল—চোখে লাগছিল—গায়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম—আমি টেবিল ফর্কটা তুলে নিলাম।

তারপর—

তারপর·····অনিলদা তুমি অত ঘাবড়ে গেলে কেন? আমি তো তাড়াতাড়ি তোমার বুকে পৌঁছে যাচ্ছিলাম। তুমি টলে পড়ে গেলে কেন? স্টেডি অনিলদা। এইবার আমরা হাত ধরাধরি করে চলে যাব। যতসব খেলাধূলা·····সাঙ্গ করি এইবেলা·····পৃথিবীতে সারাবেলা·····এটা কি কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত? না আমিই বানালাম? কিংবা অনেক গানের টুকরো কুড়িয়ে সাজানো!

কে জানে বাবা!

জেলের আকাশে বিকেল এসে পড়েছে। বাইরের পৃথিবী এখন আর আমায় টানে না। এখানে তো বেশ আছি। কত লোকজন—নিয়মকানুন। একদা আমার স্ত্রী ছিল। এখনো আছে। বাইরের দুনিয়ায় আমার একটা পরিচয়ও ছিল। আর নেই।

একটু পরেই অন্ধকার আকাশে তারা, চাঁদ, পাতলা মেঘ ইত্যাদি

জেগে উঠবে। মনোহর করে সাজানো এই পৃথিবীতে আমরা তখন যে যার জায়গায় থাকব। জেলখানায় এখন শব্দ করে পাহারা বদল হচ্ছে। জেলরের সাদা গাইটা বাছুরের মাথা চাটছে। নির্জন রাস্তায় দাঁড়ানো বড় বড় গাছ তাদের মাথা আকাশে ঠেলে পাঠিয়েছে।

লোহার গরাদে ঘেরা এই ঘরে আমি দশ ফুটের বেশি কোন-দিকেই দৌড়তে পারব না! দেওয়ালে মাথা ঠেকে যাবে। তবে এখানে সুবিধাও অনেক। আমি ইচ্ছে করলেই চোখ বুজে সব ভাবতে পারি—ফেলে আসা সবকিছু দেখতে পাই।

॥ ১২ ॥

আজ সকালে আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে।

আমার এই ছোট্ট ঘরখানায় পরিষ্কার রোদ্দুরের একখানা ফাল কাৎ হয়ে পড়েছে। অফিসঘর থেকে লোক এসে বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

বেলা দশটাও বাজেনি বোধহয়। খানিক আগে পাহারা বদলের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা পড়েছিল। বললাম, 'নিয়ে এস।'

খুট খুট করে লতা এগিয়ে এল। আমি হেসে উইস করলাম।

'তোমাকে নিতে এসেছি।'

'ভালো কথা—'

'আজই নেওয়া যাবে না। তোমাকে মেডিক্যাল বোরডের সামনে অ্যাপিয়ার হতে হবে। ওঁরা দেখতে চাইবেন তুমি প্রকৃতিস্থ কি না—'

'তাহলে কি হবে?'

'তোমার মাথার ঠিক নেই প্রমাণ হলেই তুমি কিছুদিন অবজার-ভেশনে থেকে খালাশ হয়ে যাবে—'

'কিন্তু আমি যে নিজেই বলেছি—আমি অনিলদাকে খুন করেছি।'

'বেশ করেছ। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কিছু করে ফেললে তা অপরাধ নয়। উপরন্তু অপ্রকৃতিস্থ নিবারণ পাকড়াশি যা স্বীকার করবে—তা স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে না—'

'নাহোক গিয়ে। আমি যে খুন করেছি তা তো আর মিথ্যে নয়—'

'সত্যি তুমি করেছ?'

নিবারণ মাথা নীচু করে ফেলল। পায়ের নখে লতা ফ্যাকাশে গোলাপি পালিশ মেখেছিল। সংসারে জলের কাজে তার অনেকখানি ধুয়ে গিয়ে শুধু একটু আভা লেগে আছে। 'আমার না করে উপায় ছিল না লতা—'

'কেন ?'

নিবারণ মুখ তুলে তাকাল। লতা দেখল, দুটি বড় বড় চোখ চেনা মুখখানার ওপর অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'আমি সেই নীল আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চাই। যারা সে-আলোর অধিকারী—তারা কত ভাগ্যবান। সে-আলো তোমার নেই। সে-আলো আমারও নেই। আমাদের বুকের ভেতর দিয়ে ভালবাসাবাসির স্নিগ্ধ আভা বোরোয় না লতা—'

লতা গরাদে দু'খানি হাত রেখে নিজেকে সামলালো। তারপর একমনে নিবারণকে দেখতে লাগল। তার বিশ বছরের বন্ধু। তরুণ বয়সের তীক্ষ্ণ ভাবখানা আর নেই। ঘাড়ে, গালে কিছু চর্বি জমে গেছে। নিজের বুকের ওপর হাত রেখে নিবারণ যদি এখন ভিক্ষা চায়—কিংবা গান গেয়ে ওঠে—দুইই মানাবে—কেননা, ভীষণ বিশ্বাসযোগ্য দেখাচ্ছে ওকে।

ওধার থেকে হাত বাড়িয়ে নিবারণ লতার কাঁধে রাখল, 'আমার সামনে কোন আনন্দ নেই। কিছুতেই অবাক হই না লতা। আমি কত তাড়াতাড়ি শৈশব ভুলে গেলাম—',

লতা ডান হাতখানা পাঠিয়ে দিয়ে নিবারণের বুকে রাখল। ঠিক এখনই সে আর চোখের জল চেপে রাখতে পারল না। কারণ জানে না, তবু কেঁদে ফেলল লতা।

নিবারণ সেসবে তাকালোই না। খট্‌খটে গলায় বলল, 'আমি জানি আমি কেন দুঃখ পাই না, সুখ পাই না, অবাক হই না—'

লতার মনে পড়ে গেল, নিবারণের ফাঁসি হতে পারে। লতার

মনে পড়ে গেল, অনিল দত্ত আর বেঁচে নেই। জলজ্যান্ত মানুষটা। হাত তুলে চোখের জল মুছতে ভুলে গেল লতা।

নিবারণ বলল, 'আমার শৈশব নেই—শৈশবের কোন স্মৃতি মনে নেই তাই—', লতার মাথায় হাত রেখে বলল, 'তোমারো নেই আমি জানি। আমার পকেটে শৈশব থাকলে আমি বোধ হয় অনেক জিনিসে স্বাদ পেতাম। এখন আমি মেয়েলোক, পুরুষ, বালিকা, বালকের ভেতরের সুন্দর কিছু থাকলে—তার রূপ দেখতে পাই। সেদিন একটা পুরনো রেল ইঞ্জিন এত ভাল লাগল—'

'রেবা আমাকে পাঠিয়েছে নিবারণ।'

নিবারণের কানে গেল না। সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার খুব পাখীর ডাক শুনতে ইচ্ছে করে। শুনেছি ফাঁকা দ্বীপে শুধু পাখীরাই প্রথম উড়ে উড়ে যায়—ডাকে। সেই ডাক কত খাঁটি—গলার আওয়াজে তাদের তখন দানা জেগে ওঠে। তুমি শোনোনি লতা—'

'আমাকে রেবা পাঠিয়েছে।'

থমকে গেল নিবারণ, 'কেন?'

'তোমাকে ফিরতেই হবে নিবারণ। সে কার সঙ্গে থাকবে? কি নিয়ে থাকবে?'

'এই কথা! ভালো! তুমি যেতে পার।'

'আমি যাব না।'

'সময় হয়ে গেলেই পাহারাদার এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে—'

'নিবারণ তুমি মেডিক্যাল বোরডে ঠিক ঠিক জবাব দিও।'

'বেঠিক দিলেই তো তোমাদের সুবিধে!'

'ওই হল।'

আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, অনিলদা যাওয়ার পর সেই ধাঁচের জিনিস একমাত্র আমিই এখানে পড়ে আছি। সবাই চায়—

যে যার জায়গায় যেমন ছিলাম তেমন থাকি। বেডকভারটা যেখানে ছিল তেমন থাকুক। কেউ নেই যে এগিয়ে এসে ভালো বুক দেখে খুলে ফেলবে।—আলো ছড়ানো আত্মার দলাটা সাবধানে নামিয়ে উঁচু তাকে তুলে রাখার কোন লোক নেই।

অথচ আমি যা টের পেয়েছি—তা বলে যাবার মত কাউকে দেখছি না।

আজ বিকেলে ডাক্তার সাহেব এসেছিলেন। সঙ্গে জেলার সাহেব। আমি খাট থেকে নামতে পারছি না। ক'দিন কিছু খাইনি। রুচি নেই কোন।

নাড়ী দেখার জন্যে ডাক্তার যেই আমার হাত ধরেছে—আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললাম। রেড রোডে গাড়ি থামিয়ে এই লোকটিই নেমে এসেছিল। শরীরের দুর্বল জায়গাগুলো ও ভালো করে চেনে। তদনুযায়ী লোককে আঘাত করে।

ডাক্তার জেলরের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কথা বলল।

তারপর আমাকে বলল, 'কিছু খাচ্ছেন না কেন?' মুখে কিন্তু চাপা হাসি। আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম সব। কেননা, ঘরে ঢুকে ওরা দু'জনে আমাকে যখন দেখে—আমি ভান করে চোখ বুজে পড়েছিলাম।

ওদের মধ্যে তখন এই ভাবে কথা হয়—

জেলর: খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার: তা হোক! এরকম পেসেণ্টের মাংসই খেতে ভাল।

জে: আপনার অসুবিধে না হলেই হল।

ডা: কি বলছেন! কত বড় ক্রিমিনাল। এর মাংসে আদা ছাড়া বিশেষ কিছু লাগবে না। জলে ধোবেন না। কাটাকুটির পরই প্রেসার কুকারে চাপিয়ে দেবেন। তাহলে অরিজিন্যাল স্বাদ পাওয়া যাবে।

আমি চোখ বুজে পড়ে থেকে সব শুনতে পাচ্ছিলাম। ওদের

পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক। চোখ খুলে দেখলাম ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বেশ খুশি খুশি চোখে হাসছে। দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ওপরের পাটিতে এক জায়গায় সম্ভবত মহামাংসের লম্বা ফাইবার আটকে আছে। জিভ ভাজ করে দাঁতের ফাঁকে ঠেলা দিচ্ছিল ডাক্তার। ফাইবারটা বেরিয়ে গেলে অস্বস্তি কাটে। বেরোচ্ছেনা। সেই অবস্থায় ডাক্তার খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে বলল, 'কেমন বুঝছেন?'

শুয়ে শুয়েই বললাম, 'এ যাত্রা বোধ হয় টিকে যাব—'

'টিকবেন না কেন? টিকতেই হবে আপনাকে।' বলে আমার বুক ঠুকতে লাগল ডাক্তার। তারপর বুকের ওপর মাথাটা নামিয়ে কান রাখল সেখানে। আমি ভয়ে শুয়ে শুয়েই ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম। কিরে বাবা! শেষে আমাকে জ্যান্তই কামড়ে কামড়ে খাবে নাকি! আমি কাঠ হয়ে শুয়ে রইলাম।

মাথা তুলে ডাক্তার বলল, 'আপনার হার্টের একটা ভালভ্ জখম।'

আমি চোখ খুললাম।

'সব রক্ত পাস হচ্ছে না। একটা ভালভে কিছু জমে থাকছে। খুব রেস্ট দরকার। একদম চিন্তা করা চলবে না। শুধু রিল্যাক করুন।'

আমি হাসলাম। এইতো আমার আনন্দে থাকার সময়। জেলর খুক্ খুক্ করে কাশলো দু'বার। এইটা নিশ্চয় কোন সিগন্যাল। অর্থাৎ কেশে ডাক্তারকে বলছে—'বাইরে চলুনতো একবার। সেখানেই পাকা কথা ঠিক হবে।'

ডাক্তার আমার আলজিভ দেখতে চাইল। আমার গলায় রীতি মত ব্যথা। তবু কষ্ট করে যতটা পারি হা করলাম।

ডাক্তার ছোট একটা টর্চ দিয়ে আমার মুখের ভেতর ফোকাস মারল। তারপর বোতাম টিপে টর্চটা নিভিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'হুঁ।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'কি ? কি দেখলেন ডাক্তারবাবু ?'

'কিছু না।' জেলরকে বলল, 'বাইরে চলুন—'

ওরা বেরিয়ে গিয়ে দেওয়ালের নীচেই সিঁড়ির তিনধাপ নেমে কথা বলতে লাগল। আমি লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে গরাদের গায়ে মুখ লাগিয়ে দাঁড়ালাম।

বাইরে তিনচাকার লোহার গাড়িতে জেল-হাসপাতালের খাবার যাচ্ছিল। বিকট আওয়াজ। তার ভেতরেই ডাক্তারের গলা পেলাম। কিন্তু কথা বোঝা যাচ্ছে না। জেলর কি একটা বলল। তাও শোনা গেল না। বিকেল বেলা গাঁয়ের কিছু পাখী জেলখানার ভেতরকার হরিতকি গাছটায় ডেরা ফেলেছে। ওরা তো রোজ এদিকে আসে না।

ওদিক থেকে একটা গলা পেলাম, 'কিছু টের পেতে দেওয়া চলবে না।'

'বুঝলেই মুসকিল।'

সে বান্দা আমায় পাওনি বাবারা! মনে মনে বললাম তো। কিন্তু আজই রাত কাবার হওয়ার আগে যদি ডাক্তারটা এসে হাজির হয়। তাহলে ? তাহলে কি হবে ? ওরা দু'জনে আরও কি কি বলছিল। লোহার চাকা লাগানো গাড়িটা আবার আসছে। বিতিকিচ্ছিরি শব্দ। আমার কানের ভেতর দিয়ে চাকা চলে যাচ্ছিল। তবু যতখানি শোনা যায় তার চেষ্টায় রইলাম।

জেলর বলল, 'তাহলে ওই ঠিক থাকল। হ্যাঁ। কিরকম বলুন—'

ডাক্তারের জবাব বোঝা গেল না। আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ডাক্তারবাবু বলেছে, আমার হার্টের ভেতরে একটা ভালভে খানিক খানিক রক্ত জমে থাকে। ব্লাড সার্কুলেশনে ফি'বারে ক'য়েক ফোঁটা করে জমে থাকে। তাই কি আমার বুকের ঠিক মাঝখানটায় এক এক সময় চিলিক দিয়ে ওঠে। দুপুর বেলা ফাঁকা মাঠে শুকনো পাতা তাড়িয়ে ফেরার সময়

হাওয়াকে আমি দেখতে পাই—পেলেই অমনি আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। মানে জানি না। কারণ জানি না। তবু অমন হু হু করে ওঠে। একি ভালভের ভেতরে সেই মজুত রক্তের চাপ।

ডাক্তারবাবুটি জেলরসাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল। আমি পরিষ্কার বুঝলাম, বিষয় আমি। একটু আগে আমার বুকে কান পেতে ডাক্তার কোন্ মতলব হাসিলের ফিকিরে ছিল তা আমি এইমাত্র বুঝতে পেরেছি। বুকের দু'খানা পাজরার জয়েণ্টে একখানি পাতলা হাড় আছে—তরুণাস্থি লেখে স্বাস্থ্য বইতে—চাপ দিলেই বেঁকে যায়। সেখানা সরালেই বুকের প্লেটের নীচে নেমে যাওয়ার গুহা বেরিয়ে পড়ে। কয়েক ধাপ নামলেই মুখে চোখে নীলচে আলো ছড়িয়ে পড়বে। প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তারপর সব সয়ে আসবে।

ডাক্তারবাবুটি হেসে হেসে জেলরসাহেবের কানে কানে রসালো কিছু বলছে। জেলরের কানে সুড়সুড়ি লাগছে। অথচ কান সরিয়ে নেওয়াও এখন অভদ্রতা। তাই সুড়সুড়ি খেয়েও জেলর কান কাঁপিয়ে সব শুনছিল। আমি জানি ডাক্তারবাবুটি কি বলছে। আমি যে লোকটাকে রেড্ রোড্ থেকে চিনি! ও বলছে: পেসেণ্টের নরম হাড়খানা মাথায় চাপ দিয়ে যদি ভেঙে দিতুম তাহলে ব্যথায় এখুনি হার্টফেল করত। কোন প্রবলেম থাকত না।

আমি কিছু কিছু বুঝি। এখনো ডাক্তার জিভ গুটিয়ে নিয়ে নীচের পাটির দাঁতে ঘা দিচ্ছে। যদি দাঁতের ফাঁক দিয়ে মহামাংসের বৃহৎ ফাইবার বেরিয়ে যায়। না বেরোলে একটা অস্বস্তি তো! লোকটা কি করে চুমু খায় বউকে? সে বেচারা বোধহয় আদপেই কিছু জানে না। তাই হবে। নয়তো—কি গেরো!

অথচ ও জানে না যে, খানিক মন দিয়ে চেষ্টা করলেই বুকের ভেতরে একটা বড় চামচ পাঠিয়ে দিয়ে খানিকটা ভালবাসা তুলে

আনা যায়। কিন্তু সেদিকে কি ও ঘেষবে! লোভ, আয়ু, মায়াজাল —এসব কাটিয়ে ওঠা ওর পক্ষে মুসকিল। ও তো জানেই না— ভালবাসাবাসি, মেশামিশির খাতায় আমার নাম উঠে গেছে। আমি ভালবাসাবাসির জন্য প্রদত্ত। কাল লতাও কিছু বুঝে উঠতে পারে নি।

রেবা পাঠিয়েছিল লতাকে। উইথ দি ইনটেনশন—যদি লতা আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাতে পারে। আমি ভুলছি না। উঃ!

আমার বুক জুড়ে সেই ব্যথাটা আবার হানা দিচ্ছে। আসলে আমার আত্মার কান ঘেষে ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ দিয়ে হৃদয়ে যে রক্ত চলাচল করে তার সবখানি নাকি শরীরে পাস করে না। মানুষখেগো ডাক্তারবাবুটি তো তাই বলে গেল। ও চায় আমার মাংস জলে না ধুয়ে সরাসরি মশলা মেখে প্রেসার কুকারে বসানো হোক। নইলে অরিজিন্যাল টেষ্ট নষ্ট হয়ে যাবে। ভালোরে যাদব!

উঃ!

নিবারণ পাকড়াশি গরাদ থেকে সরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার দশদিকের পৃথিবী কমতে কমতে এই ঘরখানায় এসে ঠেকেছে এখন। বুকের ওপর হাত রেখে বুঝে উঠতে পারল না—সত্যিই তার হৃদয়ের কোন্ ভালভে রক্ত জমে যাচ্ছে।

শরীর ধরে এগোলে তবে ভালবাসাবাসি হয়। তাই তা এত ঠুনকো। অথচ শেষ অব্দি ভালবাসাবাসির পথে এই শরীরখানাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রেড্ রোডের এই ডাক্তারবাবুটির আবার খাস্তা শরীর না হলে চলে না। ও যে কত লিভার, কত দাবনার রোস্ট খেয়েছে তার অন্ত নেই। আসলে মানুষের মহামাংসের ক্ষিধে অনন্ত। নানারকম ফোকাসে পড়ে আমরা ভুলে থাকি। নয়ত মানুষ কতকাল মানুষেরই মাংস খেয়ে আসছে নানাভাবে। আমিই তার ভেতর

থেকে পথ করে নিয়ে আত্মার নীল আলো ছড়ানো গুহামুখে গিয়ে প্রথম হাজির হই। এজন্যে আমাকে বুকের অনেক ভেতরে নামতে হয়েছে। একটু একটু করে এগিয়েছি। পথ হারাই নি।

সে এখন খুব পরিচিত একটি পথের ভিতর দিয়া আগাইতেছিল। চলাফেরা উৎফুল্ল। পাশে তার অনিলদা। দামী ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্পসু। দু'জনে মনের কথা বলিতে বলিতে একটি সেতু পার হইল। সামনেই একটি ধূসর প্রান্তর। তাহার আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। একজন আদিবাসী শিকারী ধনুক কাঁধে দূরে বানবিদ্ধ ঘুঘুটাকে ধরিতে ছুটিল। দু'জনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, দিগন্ত পার হইয়া যাওয়া শিকারী তখনও কোন পাখী পায় নাই।

'তোর হাতে আমার মরার কথা ছিল না নিবারণ।'

'আমিও ভাবিনি অনিলদা।'

বলিতে বলিতে দু'জনেই একটি বিরাট তুতে গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িল। গাছটি ছায়া এবং আশ্রয় দুইই দিয়াছে। এক পাশ দিয়া একটি জীর্ণ দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ খানিক দূর প্রসারিত হইয়া আপনাআপনি নানান গুল্মলতায় ঢাকা পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে।

সেদিকে তাকাইয়া নিবারণের মনে হইল, এই পত্র স্পন্দন, এই ছায়াচ্ছন্ন নিবিড়তার—ইহার মধ্যে সে খুব মূল্যবান একটি চাবি খোয়াইয়া বসিয়া আছে। এই চাবি থাকিলে মৃত অনিল দত্ত আজই এখনই নিবারণের হাত ধরিয়া পরিচিত লোকালয়ে চলিয়া যাইত।

নিবারণ তখন বুঝিয়াছে—সে অনিলদার সুখসঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে। তাহার হাতে এমন কোন পরিচয় পত্র নাই—যাহা দিয়া ভাগ্যক্রমে ফিরিয়া পাওয়া অনিলদা ও তাহার জগতে পাকাপাকি যাওয়া যায় এবং থাকিয়া যাওয়া যায়।

হারাইবার ভয়ে নিবারণ পাকড়াশি অনিল দত্তর হাতখানি ভাল করিয়া ধরিল।

বাতাসে সুগন্ধ। বোঝা যায় না কোথা হইতে আসিতেছে।

বোঝা যায় না—এখন সে স্মৃতি না স্বপ্নে আছে।

সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে নিবারণ টের পাইল—একে একে সবাই ভাসিয়া উঠিতেছে। প্রথমেই রেবা, তারপর শশধর—ক্রমে ক্রমে লতা ও হাকিমও তাহার চোখের সামনে দেখা দিল।

ডাক্তারবাবুটির কথা একবারও তাহার মনে পড়িল না।